

ফিলিস্তিনিদের লড়াই আমাদেরও : পৃষ্ঠা ৩
লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই : পৃষ্ঠা ৪

আমেরিকায় উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয় : গণহত্যা ও জায়নবাদ বিরোধী আন্দোলনের : পৃষ্ঠা ১৬
প্রসঙ্গ বুয়েট : ছাত্র রাজনীতি কি বলির পাঠা? : পৃষ্ঠা ১৬

ভারতের পানি আত্মসনে উত্তরবঙ্গ কী মরুভূমি হবে? তিস্তাসহ সকল নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

ঢাকা থেকে-তিস্তা ব্যারেজ
বাসদের তিস্তামার্চ অনুষ্ঠিত

তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ঢাকা থেকে তিস্তা ব্যারেজ ৩ দিনব্যাপী (২১-২৩ এপ্রিল) তিস্তামার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ২১ এপ্রিল '২৪ সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে রোডমার্চের উদ্বোধন করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, সদস্য জুলফিকার আলী ও কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন। উদ্বোধনী সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নদী ও পানি গবেষক, সাংবাদিক শেখ রোকন।

উদ্বোধনী সমাবেশ শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে মিছিল শুরু হয়ে তোপখানা রোড, পল্টন মোড় ঘুরে সেগুনবাগিচা স্ট্রিট রিপোর্টার্স ইউনিটির সামনে এসে শেষ হয়। এরপর তিস্তামার্চের বহর সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

তিস্তা এবং উত্তরবঙ্গের বাঁচামরা নদীর পানির স্বাভাবিক গতি এবং গন্তব্য কী, তা আমরা সবাই জানি। বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়া



নদী দেখে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আমরা যা জানি তা সরকারসমূহ মানেন কি?

সাধারণত পর্বত, উঁচু ভূমি, পাহাড়ের গিরিখাত, হিমবাহ ও বৃষ্টি থেকে সৃষ্ট ঝরনাধারা, বরফগলিত শ্রোত কিংবা প্রাকৃতিক পরিবর্তন থেকে অসংখ্য শ্রোতধারা একত্রিত হয়ে নদীর জন্ম। হাজার হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে তীব্র বেগে প্রবাহিত জলরাশিতে এক প্রচণ্ড গতি সঞ্চারিত হয়। নদী যখন পাহাড়ি এলাকার ঢালু পথ বেয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর প্রচণ্ড গতি থাকে। এ সময় নদী উৎপত্তিস্থল থেকে

নুড়ি-পাথর, বালি-খনিজ উপাদান, পলি প্রভৃতি শ্রোতের ধারায় নিয়ে সমুদ্রে অভিমুখে ধাবিত হয় বা অন্য নদীতে মেশে। নদী এভাবেই আবহমানকাল ধরে পৃথিবীর পর্বত, পাহাড় ও উঁচু ভূমি ক্ষয় করে চলে। এ প্রক্রিয়ায় সমস্ত নদী-অববাহিকা সমভূমি বা প্রায় সমভূমি অঞ্চলে পরিণত হয়।

পানি ওপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয় এবং নদী সৃষ্টির মাধ্যমে একেবেকে সাগরে গিয়ে মেশে। এর কোনো সীমানা নেই, দেশের নাম পাল্টায়, এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

মেট্রোরেল ভাট আরোপের
প্রক্রিয়া বন্ধ কর

রেলের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার
কর—বাসদ

নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছেই। এক্ষেত্রে সরকারের সরকারের কাজ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা চলে যে, সরকার হয় দাম বাড়ায় নয়তো নয়তো দাম বৃদ্ধির পক্ষে সাফাই গায়। একটা বাজেট মানেই জনগণের কাছে আর এক দফা দাম বৃদ্ধির ঘোষণা। এখন সরকার অনেক স্মার্ট। বাজেটের আগেই দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। যেমন বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, তেলের দাম বাড়ানোর পর রেলের ভাড়া বাড়ানো হলো। সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, দেশে জনগণের জন্য কোনো সেবা আর থাকবে না। গণপরিবহন, জনগণের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সব কিছুই বাণিজ্যিক করে ফেলা হচ্ছে। সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য, সরকারের ব্যবসায়ী তোষণ নীতি আর সমস্ত সেবামূলক খাতকে মুনাফার খাতে পরিণত করা সবই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফল। সংসদকে ব্যবসায়ী ও কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত করার বিরুদ্ধে কথা বললেই অনেকে সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠেন। তারা বলেন, এসব বামপন্থি কথা বাদ দেন। ব্যবসায়ীরা কি রাজনীতি করতে পারবে না? জনগণের একটা বিরাট অংশ দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের কারণে যে শোষণমূলক এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের ২০তম মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

আমরা কেউ সমাজের দায় এড়াতে পারি না, বিপ্লবের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে আসুন



বৈষম্যমূলক এই সমাজের একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে পাহাড়সম সংকট। এ অবস্থার অবসান চায় সবাই। কিন্তু সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া এই বৈষম্যের অবসান ও মানবিক সমাজ সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিপ্লবের এই কর্মযজ্ঞ বিশাল। বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে

এই স্বপ্নপূরণ করতে হবে। এই আহ্বান নিয়ে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের ২০তম বার্ষিক মিলনমেলা ২৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে

ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। মিলনমেলার উদ্বোধন করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান।

কমরেড খালেদুজ্জামান উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, আজ আমরা মিলিত

হয়েছি আমাদের ২০তম সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী, দরদিদের মিলনমেলায়। সারাদিনের এই মিলনমেলায় শিশু-কিশোর, যুবা-পৌচ, বৃদ্ধ, পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়পরিজন, সমাজের বিশিষ্টজন, বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রগতির স্বপ্নে মিলিত মানুষের এক অভাবিত পরিবেশ রচিত হবে। ইতিমধ্যে অনেকে এসে জড়ে হয়েছেন। শিশুরা ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভয়ভীতিমুক্ত আবহাওয়ায় আনন্দে ছোটাছুটি করছে। কেউ গান, কেউ নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুধীজনরা একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করছেন। আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা আজকের দিনটিতে সাংগঠনিক বাধাধরা নিয়মবিধির বাইরে সমতায়, মমতায় সকলে সকলের হয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মুক্তির জন্য যুদ্ধে আত্মত্যাগের মহিমায় ধর্ম-গোত্র, জাতপাত-অঞ্চল ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সংগ্রামী জনতার এক সত্তার যে বাঁধন একদিন গড়ে উঠেছিল, স্বাধীন দেশের শাসকগোষ্ঠী সেদিনের গণআকাজ্জা ও গণচেতনা দিনে দিনে নস্যাত করে পুঁজির ও ক্ষমতার মানদণ্ডে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আমরা কেউ সমাজের দায় এড়াতে পারি না, বিপ্লবের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমন বিভেদ রেখা ও বিরোধের দূরত্ব তৈরি করেছে যার কারণে আজকের জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বীরগাঁথা প্রকৃত ইতিহাস না হয়ে ব্যক্তি কিংবা দলের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তির সোনালী দিনের পরিবর্তে আজ দুঃসময়ের দুঃসহ পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। ইতিহাসের নিয়মেই আবার নবচেতনায় সংগ্রামী ঐক্যের ডাক আসবে। শুভদিন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় জাগবে। আজকে প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ। অসাম্প্রদায়িক ভাবনা, বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা, প্রকৃত ইতিহাসবোধ, নবপ্রজন্মের কাছে রাখা নবসৃষ্টির উদ্দীপনা। এইদিনে আমরা যা করতে চাই তার অনেক সীমাবদ্ধতা আমরা অতীতেও উল্লেখ করেছি, যা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি; তবে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই একদিনের ব্যতিক্রমী আয়োজন আমাদের হারিয়ে যাওয়া অনেক ঐতিহ্যকে স্মরণে আনছে, আগামীতে আরও উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল হবে এই আশায় আমি আজকের মিলনমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

মিলনমেলায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্টের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আক্তার কবির, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, কবি মোহন রায়হান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবিদুর রেজা, অ্যাড. শাহীন, প্রগতিশীল কৃষিবিদ কেন্দ্রের সভাপতি কৃষিবিদ ড. সামছুল হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণমুক্তি ইউনিয়নের নাসির উদ্দীন নাসু, সাবেক ছাত্রনেতা মেহের নিগার চঞ্চল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম, সাবেক যুগ্ম সচিব রাশিদুজ্জামান, সাবেক ছাত্রনেতা জিএম ফারুক, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, ব্যারিস্টার ফারাখ খান, গণতন্ত্রী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. শহীদুল্লাহ সিকদার, বিলস-এর নির্বাহী পরিচালক সুলতান উদ্দীন আহম্মদ, জাকসুর সাবেক জিএস আজিজুল হাসান চৌধুরী শাহীন।

মিলনমেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন, সিপিবি সভাপতি কমরেড শাহ আলম, সিপিবি নেতা সাজ্জাদ জহির চন্দন, আব্দুল্লাহ হেল কাফি রতন, রুহুল আমিন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, নারী মৈত্রীর সভাপতি বহিঃশিখা জামালী, রাকসুর সাবেক ভিপি রাগিব আহসান মুন্না, সিনিয়র সাংবাদিক সাবেক ছাত্রনেতা মাসুদ কামাল খান, ডাকসুর সাবেক জিএস ছাত্রনেতা ও বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা ড. বীণা সিকদার, সাংবাদিক, লেখক ও নদী গবেষক শেখ রোকন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি দীপক শীল, জেএসএস-এর দীপায়ন খিসা, শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন মন্টু, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাসিমুল হাসান জুয়েল, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, শামীম ইমাম, সোনার বাংলা পার্টির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

মিলনমেলার সভাপতির বক্তব্যে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, দেশজুড়ে তীব্র দাবদাহ চলছে, এই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও সারাদেশ থেকে পার্টির নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী, দরদি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক-আইনজীবী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী-চিকিৎসক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক-কৃষক, নারীসহ গণসংগঠন, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যারা এই মিলনমেলায় উপস্থিত হয়ে আয়োজনকে সফল ও সার্থক করে তুলেছেন, পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই মিলনমেলায় রাজনীতিক, কবি-সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী-কৃষিবিদসহ ২১ জন বক্তব্য রেখেছেন। এর মধ্যদিয়ে আমরা নানা মতের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি, নানা পরামর্শ পেয়েছি। এগুলো আমাদের দলের চিন্তা-ভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে, কর্মস্পৃহা ও অনুপ্রেরণা জোগাবে। আরও যারা উপস্থিত ছিলেন সময়ের অভাবে তারা বলতে পারেননি। তাদের কথা শুনতে পারলে আমরা আরও ঋদ্ধ হতে পারতাম।

আজকে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও জনজীবনের সংকটের প্রেক্ষাপটে এখানে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন। এখন দেশের যে সকল সংকট দৃশ্যমান—বাজার সিভিকিটের দৌরাণ্ড, দফায় দফায় বিদ্যুৎসহ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সেগুলো ফেরত না দিয়ে লুটপাটের ফলে ব্যাংকগুলো রুগণ হয়ে পড়েছে, টাকা পাচার, শাসক দল দুর্নীতিতে আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এখানে যে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে—এগুলো হলো তার উপরিকাঠামোগত ফলাফল। এক কথায়



আমাদের দেশের শ্রমজীবী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণ ভালো নেই। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের দাম পায় না, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। বর্তমান সরকার তিন মেয়াদ পূর্ণ করে চতুর্থ মেয়াদের শাসন কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। শিক্ষাকে করেছে ব্যয়বহুল, সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্যিক। নতুন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে বসেছে। এর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ সোচ্চার রয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র্যাঙ্কিংয়ে কেন পিছিয়ে? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে ভূমিকা দিন দিন তিরোহিত হতে চলেছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের আয়োজন নেই, মুক্ত চিন্তার চর্চা, মেধার উৎকর্ষতা চর্চার স্থান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকা রাখতে পারছে না।

নারীরা—দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি, তারা প্রতিনিয়ত অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আইনগতভাবেই তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সম্পত্তিতে সমঅধিকার, সমকাজে সমমজুরি নাই। সংবিধানে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমঅধিকারের কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। পারিবারিক আইনে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কার্যকর আছে শরিয়ত আইন। এর মধ্য দিয়ে বৈষম্য টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।

মানুষ এখন গণতন্ত্র-ভোটাধিকার থেকে

বঞ্চিত হচ্ছে। বাকস্বাধীনতাকে হরণ করা হচ্ছে কালো আইনের বেড়াজালে। এখন একটা প্রশ্ন যৌক্তিকভাবে সামনে আসছে যে—আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন থেকে মুক্তি আসবে কীভাবে। আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি অনেক দেশে স্বৈরশাসক ২০-২৫ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় টিকে ছিল কিন্তু একটা সময় তাদের গণ-আন্দোলনের মুখে পালাতে হয়েছে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রায় ২০০ বছর জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতায় টিকে ছিল। এদের বিরুদ্ধে মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করতে হয়েছে। অনেক জীবন বলি দিতে হয়েছে, জেল-জুলুম, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে পরিশেষে স্বাধীনতা এসেছে। পাকিস্তানিরা ২৩ বছর একইভাবে ক্ষমতা টিকে ছিল। বাংলাদেশের মানুষ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, অনেক প্রাণ বলিদানের মধ্যদিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতার পর গত ৫৩ বছর ধনিকশ্রেণির বুর্জোয়া দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে মানুষের ওপর দমনপীড়ন চালিয়ে আসছে। লুটপাট-দুর্নীতি অব্যাহত রেখেছে মানুষের অধিকার বঞ্চিত করে চলছে। এই ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে না পারলে, মানুষের মুক্তি আসবে না অধিকার বাস্তবায়িত হবে না। সে কারণে ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসককে উৎখাত করতে হবে। এর জন্য একটা সঠিক রণকৌশল নির্ধারিত হওয়া দরকার। আমাদের পরিচয় কী? আমরা বামপন্থি। আমরা কী করতে চাই?

অর্থাৎ, বুর্জোয়ারা যা করছে তা জনস্বার্থে নয়, আমরা জনস্বার্থে এটা এটা করবো, যা করতে চাই, তা কীভাবে বাস্তবায়ন করবো তা স্পষ্ট করে, সুনির্দিষ্টভাবে সহজ ভাষায় বোধগম্য করে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কেউ কেউ বলছেন আমরা জনগণের ভাষা বুঝি কি না, জনগণ আমাদের ভাষা বুঝে কিনা, মানুষ বুঝে আমরা সে ভাষায় কথা কথা বলতে পারি কিনা? তাদের বক্তব্যের প্রতি সম্মান রেখেই বলেছি—আমাদের সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় কম, যে মাত্রায় জনগণের কাছে, বিশেষ করে মেহনতি জনগণের কাছে যাওয়া দরকার, তা পারছি না এটা ঠিক কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হলো—আমরা যেখানে শ্রমজীবী মানুষকে দলের সাথে যুক্ত করতে পেরেছি, সেখানে আমরা তাদের সংগঠিত করতে পেরেছি, যেতে পেরেছি সেখানে আমরা ফল পেয়েছি। এক্ষেত্রে ভাষা বুঝার কিংবা বুঝানোর সমস্যা হয়নি। বরং সঠিক সময়ে জনগণের সঠিক দাবিটা তুলতে পেরেছি কিনা, ব্যাপক মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিতে পারছি কিনা, মানুষকে শামিল করতে পেরেছি কিনা সেটাই প্রশ্ন। এ দেশের মানুষ যুক্ত হয়েছে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে; ৭১ স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ৮০ দশকে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে মানুষকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ভাষার সমস্যা হয়নি। আমরা মনে করি আমাদের সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতা রয়েছে, ভাষার সমস্যা নয়। সেই দুর্বলতা কাটাতে পারলে

গণ-আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করা যাবে, গণঅভ্যুত্থান করা যাবে।

৭ জানুয়ারির পর অনেকে বলছেন, তা হলে কী বর্তমান সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশবাসী মুক্তি পাবে না। এখানে বলতে চাই, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে '৮৮-এর নির্বাচনের পরও এমন একটা অবস্থা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলেও উন্নয়নের দশক পালনের পরই '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব শাহির পতন হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতা দেশবাসীর কাছে।

৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে ৮টি নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে। এই নির্বাচনগুলোর কোনোটিই সূষ্ঠা ও অবাধ হয়নি। চারটি নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে সেগুলো আপেক্ষিক অর্থে সূষ্ঠা হয়েছে। কেন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সূষ্ঠা হতে পারে না? কারণ পুঁজির উন্মেষের কাল ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার কাল। তখন তারা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটা সময় পর্যন্ত অবাধ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পেরেছিল, নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া স্তরে প্রবেশ করে তখন শাসন ব্যবস্থায় দমন-পীড়ন, স্বৈরাচারী, স্বৈরাচারী বিষয়গুলো আসলো। নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আর আগের মতো অবাধ থাকলো না। আর যখন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করলো, পুঁজি কেন্দ্রীভূত, পুঁজিভূত হলো, বাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো, তখন বুর্জোয়াদের পক্ষে অবাধ প্রতিযোগিতা আর বজায় রাখা সম্ভব হলো না। শাসন ব্যবস্থায়ও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশও খুলে গেল দেখা গেল বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে পারছে না, মানুষের ভোটাধিকারও রক্ষা করা যাচ্ছে না। জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে বুর্জোয়াদের চাওয়া বিপরীতমুখী হয়ে গেল। তখন তারা জনগণের উপর আস্থা না রেখে সামরিক-বেসামরিক আমলা, শিল্পমালিক-ব্যবসায়ী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর হয়ে পড়লো। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে বাজার ও দেশ দখল, সম্পদ লুণ্ঠন শুরু করলো আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সকল মহিমা হারিয়ে এখন সূষ্ঠা ও অবাধ নির্বাচন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো। যে কারণে, এখন পৃথিবীর কোনো দেশে আর সূষ্ঠা নির্বাচন হতে পারছে না। আমাদের দেশে যদি ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে বুর্জোয়াদের দ্বারা আর সম্ভব হবে না। তাই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের আন্দোলনের মাধ্যমেই গণতন্ত্র, ভোটাধিকার করেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমাদের দলের প্রতিষ্ঠার লগ্নেই আমরা বলেছিলাম শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক দল মানেই কোন না কোন শ্রেণির দল। আর সে দল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি চিন্তা ও মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সত্য যেমন একটিই সত্য দুটি হতে পারে না, তেমনি একটা দেশে সঠিক বিপ্লবী দলও একটার বেশি থাকতে পারে না। আর বুর্জোয়া ও পেট্রিবুর্জোয়াদের অনেকগুলো দল থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে দেশে কোনও সঠিক বিপ্লবী দল নাও থাকতে পারে। যদি বিপ্লবী দল না থাকে তাহলে সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো সত্য থাকতে পারে না।

সঠিক বিপ্লবী দলের জন্য প্রথমে প্রয়োজন, মার্কসীয় মূলদৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ এর মধ্যদিয়ে নির্দিষ্ট দেশের শোষণের স্বরূপ জানা এবং শত্রু-মিত্র

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফিলিস্তিনিদের লড়াই আমাদেরও

ফিলিস্তিন সংহতি কমিটির নারী ও শিশু সমাবেশ

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ৩ মে '২৪ শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'নারী ও শিশু সংহতি' সমাবেশের আয়োজন করে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি নারী সেক্রের সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শম্মা বসু, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আইনুন নাহার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরাফা মিশু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা নিত্রা, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের অ্যাড. ফরিদা ইয়াসমিন নাইস, নিলুফার ইয়াসমিন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী রূপসী চাকমা, ভাসানী নারী মুক্তি পরিষদের আহবায়ক সোনিয়া আকতার প্রমুখ। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন তাহেরা বেগম ও সমাবেশ সঞ্চালনা করেন ফিলিস্তিন সংহতি কমিটির সদস্য ডা. হারুন-অর-রশিদ।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মানুষ প্রাণপণ লড়াই করছেন। সে লড়াই বিচ্ছিন্ন কোনো লড়াই নয়। সে লড়াই আমাদেরও লড়াই। এ লড়াই সারা পৃথিবীর মানুষের লড়াই।

ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তা সামান্য নয়। ফিলিস্তিনের শিশু, নারীর যে আত্মনাদ, কান্না; তা সারা বিশ্বের বিপন্ন আত্মমানুষের কান্না, চিৎকার। এখন ফিলিস্তিন হচ্ছে বিপন্ন, নিপীড়িত মানুষের বাসভূমি। ফিলিস্তিনে ইসরায়েল যা করছে, তা মানবসভ্যতা ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার কাজ। ফিলিস্তিনের মানুষের ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসনের কারণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হচ্ছে এই শতকের হিটলার। হিটলার সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। পরে হিটলার আত্মহত্যা করেছে। তারপর আশা করা হয়েছিল যে পৃথিবীতে হিটলার আর আসবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বড় হিটলার চলে গেছে,



ছোট ছোট হিটলার পৃথিবীজুড়ে দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হিটলারকে জন্ম দিয়েছিল, যা এখনো বিদ্যমান। সে জন্যই নতুন নতুন হিটলার আসছে। হিটলার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে ব্যক্তিমালিকানা জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ফিলিস্তিনের বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে সমাবেশ মঞ্চের কাছে রাখা হয় প্রতীকী লাশ ও রক্তাক্ত জামা। এ ছাড়া মঞ্চের পাশে প্যাকার্ডে লেখা ছিল 'স্টপ জেনোসাইড' (গণহত্যা বন্ধ করো) এবং 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' (ফিলিস্তিন স্বাধীন করো)।

সমাবেশ চলার ফাঁকে ফাঁকে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনে গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। তাঁদের কারও গলায়, কারও হাতে ঝুলছিল পোস্টার-প্ল্যাকার্ড। সেসব পোস্টারে ইসরায়েলের নারকীয় বিভৎসতা তুলে ধরা হয় এবং ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সংহতি জানানোর পাশাপাশি ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের দাবি তোলা হয়। সমাবেশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চের সামনে ছিল এক দল

শিশু। তারা রং-তুলির আঁচড়ে ফিলিস্তিনের শিশুদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে।

সমাবেশ থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, ইসরায়েল ফিলিস্তিনে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার পেছনে মদদদাতাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো।

ঘোষণাপত্রে সাত দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফিলিস্তিন শিশু ও নারীসহ ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধ করা; ফিলিস্তিনিদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসাসামগ্রী ও জ্বালানি নিশ্চিত করা; যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশের অস্ত্র সরবরাহে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রভৃতি।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ফিলিস্তিনের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম কিশকো। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থন জানাতে সমাবেশে আসা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

ইব্রাহিম কিশকো বলেন, গাজা পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ফিলিস্তিনের মানুষের ন্যায় দাবি ও ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে আওয়াজ তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, সাম্যবাদী আন্দোলনের কমরেড শুভাংশু চক্রবর্তী, বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদ সাইফুল হক, গণমুক্তি ইউনিয়নের নাসির উদ্দীন নাসু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, শিল্পী অরুণ রাহী প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে ফিলিস্তিনের মানুষের পক্ষে এবং ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিল বের করা হয়। এই মিছিল শাহবাগ থেকে কাঁটাবন হয়ে টিএসসি যায়। সমাবেশ ও মিছিলে কয়েক শ নারী-শিশু ও রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়।

শোষণমুক্তির সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলুন



চারু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

চারু সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড কার্যালয়ে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয়

সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, জসিমউদ্দিন। চারু লালবাগ, সূত্রাপুর, মিরপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জ শাখা তাদের পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ : ফরিদপুর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ফরিদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠক সজল বাউড়ে-এর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মোসাদ্দেক হোসেন ঢালী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব

অশোক শিংহ রায়, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, মফিজ ইমাম মিলন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তা বাউড়ে ও সোহাইল আহমেদ শুভ।

অনুষ্ঠানে জুড়ো কারাত কসরত প্রদর্শন করেন সখিগতা বর্মন ও অঙ্কিতা বর্মন, নাটক 'বই' প্রদর্শন করে রাজেন্দ্র কলেজ থিয়েটার। আয়োজকরা পরীক্ষার্থীদের উপহার প্রদান করেন।



লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই

(পূর্ব প্রকাশের পর)



ভ. ই লেনিন

(জন্ম : ২২ এপ্রিল ১৮৭০; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪)

[এ বছর ২১ জানুয়ারি রুশ বিপ্লবের নেতা এবং বিশ্ববিপ্লবের নেতা এবং বিশ্ববিপ্লবের প্রেরণা ভ. ই. লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি '২৪ সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র-এর উদ্যোগে 'লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই' শিরোনামে আলোচনাসভায় কমরেড খালেকুজ্জানের প্রদত্ত বক্তব্য ভ্যানগার্ডে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে। এ সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তি। সম্পাদক]

এই পথে, উৎপাদন রূপান্তরিত হয় 'বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের একটি প্রক্রিয়ায়' (পুঁজি, খণ্ড-১, ৬১৯) এবং যার কারণে একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অংশকে পুঁজিপতিরা আরও কমিয়ে আনতে পারে, অর্থাৎ আপেক্ষিক উদ্ভূত-মূল্যকে বৃদ্ধি করতে পারে। বর্তমান সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উৎপাদন 'বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের একটি প্রক্রিয়ায়' পর্যবসিত হয় কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। মার্কসের ব্যাখ্যা হলো 'জ্ঞান এবং দক্ষতার সঞ্চয়, সামাজিক মস্তিষ্কের সাধারণ উৎপাদনশীল শক্তিগুলি এইভাবে পুঁজিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়' (the accumulation of knowledge and of skill, of the general productive forces of the social brain, is thus absorbed into capital')। এইভাবে, মার্কস দেখিয়েছিলেন যে 'পুঁজি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদনের পদ্ধতি তৈরি করে' (capital has posited the mode of production corresponding to it) এবং 'সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াটি আর শ্রমিকের প্রত্যক্ষ দক্ষতার অধীনে থাকে না, বরং বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের বিষয় হয়ে ওঠে' (the entire production process appears as not subsumed under the direct skillfulness of the worker, but rather as the technological application of science)। (মার্কস, ১৯৭৩, ৬৯৪, ৬৯৯) আজকের সময়ে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার প্রয়োগ-তা সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হোক বা রোবটিক্সের আগমণ-মার্কসের বিশ্লেষণের সত্যতাকেই প্রমাণ করে। অভিনবত্বের গুণে অভূতপূর্ব বিবেচনায় আমরা বিস্ময়াভিভূত হলেও প্রকৃত বিচারে এমন কিছু রূপান্তরিত রূপই পুঁজিবাদে সম্ভব।

আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আমরা তাই বলতে পারি যে উদ্ভূত-মূল্যকে ভিত্তি করে শ্রম-শক্তির শোষণ, সম্পদ লুণ্ঠন, ক্রমাগত পুঁজির সঞ্চয়ন এবং লগ্নী-পুঁজির ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের বাস্তব রূপ। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত-মূল্য সম্পর্কে একটি বিভ্রমের কথা বলি। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে এঙ্গেলস পুঁজি গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সংযোজনীতে মূল্য (value) নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গে মার্কসের ধারণার (concept) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আসার পরে কীভাবে স্থানীয় খুচরো বাজারে দামের

(price) গঠন সম্পূর্ণ ভিন্নতর মুনাফা হারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সেই কারণেও সমস্ত দেশের জনসাধারণই, যাঁরা পণ্যের শেষতম ভোক্তা, তাঁরা অনেক সময় অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়। যার সত্যতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকেই অনুভব করতে পারি। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, খুচরো বাজারের দাম (price), মূল্য (value) অনুযায়ী হয় না।

এর সাথে আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যা থেকে নভেম্বর বিপ্লবের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ও যথার্থতা প্রকাশ পায়। বিশ্বজুড়ে সর্বত্রই মেহনতি জনতার মাঝে বিপ্লবের বা শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তেই মাঝে মাঝে অপরিকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ, কোথাও বা অত্যন্ত সংগঠিত আন্দোলনের ঘটনা ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, ফ্রান্স, ইতালি, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, গ্রিস, জার্মানি, পর্তুগাল এবং নেদারল্যান্ডে কৃষকরা রাস্তায় হাজির হয়েছিলেন। বেলজিয়ামে, কৃষকরা ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম বন্দর এন্টওয়ার্পে পৌঁছে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। জার্মানিতে তুষারপাতের মধ্যে, হাজার হাজার কৃষক গত মাসে হামবুর্গ, কোলন, নুরেমবার্গ এবং মিউনিখসহ শহরগুলিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বছর দুই আগে ভারতের কৃষকরা রাজধানী দিল্লিকে কয়েকমাস ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

গত শতাব্দীর সূচনায় লেনিন-বর্ণিত লগ্নী পুঁজির আবির্ভাবের পর, এই দুটো বিষয়ের সাপেক্ষে বিশ্বের বাস্তবতা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে যে অবস্থায় ছিল তা মৌলিকভাবে অপরিবর্তিতই আছে, যদিও বহিরঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এই কারণে, দেশে দেশে লড়াইকে যদি আমরা মুক্তির লড়াই বলি, তবে আমাদের সেই মুক্তির লড়াইয়ের অভিমুখ এখনো অবশ্যই হতে হবে উদ্ভূত মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণির শ্রম-শক্তির নগ্ন শোষণের যে ব্যবস্থা তার অবসানের লড়াই। আর এই বিবেচনাতেই লেনিন আমাদের কাছে এখনো আলোকবর্তিকার মতো, কারণ পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জনের পর তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চরিত্র কেমন হবে, লড়াই করার জন্য কী কী আবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে—সেইসব পাঠদান তিনি করেছেন তাঁর কর্মে, জীবনে ও তত্ত্বে।

মার্কসবাদের এক বুনিয়াদী শিক্ষা লেনিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'the living soul of Marxism is the concrete analysis of a concrete situation' (লেনিন রচনাবলি-৩১, পৃ-১৬৬)। রাশিয়ার বাস্তবতায় বিপ্লবী তত্ত্বকে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে, মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে হলে নির্দিষ্ট দেশের বাস্তবতায় তাকে বিশেষায়িত করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে, এর প্রয়োগ ইংল্যান্ডে যেমনভাবে হবে, ফ্রান্সে সেইভাবে হবে না; ফ্রান্সে যেমন হবে, জার্মানিতে তেমন হবে না; আবার জার্মানিতে যেমন হবে, রাশিয়াতে তেমন হবে না। (লেনিন রচনাবলি-৪, পৃ-২১২) ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব যেভাবে হয়েছে, ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লব সেইভাবে হয়নি। আজকে আমাদের দেশের বিপ্লবও তাই হুবহু রুশ বা চীন বিপ্লবের মতো হবে না। হবে না এই কারণে নয় যে রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের পর থেকে অনেক সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি। হবে না এই কারণেই যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সর্বহারাশ্রেণির রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার কোনটাই হুবহু তার পূর্ববর্তী কোন বিপ্লবের মতো করে হয়নি এবং মার্কসবাদ অনুযায়ী তা হওয়ার কথাও ছিল না। আমাদের দেশের জন্য নির্দিষ্ট পথটি মার্কসবাদের চিন্তার আলোকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। গত শতাব্দীর সূচনায় রুশ দেশে বিপ্লব হলেও

আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সেই বিশিষ্ট ভিন্নতর পথ খুঁজে নিতে হতো, এখনো করতে হবে।

আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থাতেও বর্তমান সময়ের দেশে দেশে লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের আলোচিত দ্বিতীয় একটি শিক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। তা হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সর্বহারা বিপ্লব বা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব সংঘটিত হবে না। তারজন্য চাই একটি শ্রেণিসচেতন, শৃঙ্খলাবদ্ধ দল (class conscious discipline organised force) যার নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে থাকবে 'একদল পেশাদার বিপ্লবী'। তীব্র মতবাদিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটি মার্কসবাদী পার্টি গঠনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন, যা আজও আমাদের ক্ষেত্রে কম-বেশি প্রাসঙ্গিক। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতা যথার্থ শ্রেণি-চেতনা হতে পারে না যদি না 'জীবনের সমস্ত দিককে (the materialist estimate of all aspects of the life) ব্যুৎ করে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও বিচার ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ' করতে পারা শেখা না যায়। এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকেই মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গীন জীবন-দর্শন। (লেনিন রচনাবলি-৫, পৃ- ৪১২) আবার, একটি সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বকে ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট রণনীতি ছাড়া কোন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। (Without revolutionary theory there can be no revolutionary movement. লেনিন রচনাবলি-৫, পৃ-৩৬৯) অতএব, বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী পার্টি এবং একদল পেশাদার বিপ্লবী ছাড়া বিপ্লব হবে না। লেনিন পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে যে দুইটি কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তারমধ্যে এটি ছিল প্রথম, অর্থাৎ বিপ্লবের লক্ষ্যে সঠিক নীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন গড়ে তোলা। দ্বিতীয়টি হলো শ্রমিকদের মাঝে যাওয়া, শ্রমিক মুক্তির আদর্শ হিসাবে মার্কসবাদকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং তার জন্য শ্রমিকদের পাঠচক্র সংগঠিত করা। লেনিন বড় বড় কারখানার শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন, যাদের মধ্য থেকে বলশেভিক বিপ্লবের নেতৃত্বকারী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। যেমন, বস্টিক জাহাজ নির্মাণ কারখানার শ্রমিক ভ. আ. শেলগুনভ, সেন্ট পিটার্সবুর্গের সেমায়ানিকভ কারখানার শ্রমিক ইভান ভ্যাসিলিভিচ বাবুশকিন, আলেকজান্দ্রাভ যন্ত্র কারখানার শ্রমিক ন. ইয়. মের্কুলভ এবং এই রকম শত শত। আজকের দিনেও যে কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য এবং কার্যকরী শর্ত।

লেনিনের শিক্ষা হলো একজন কমিউনিস্টকে (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট) জনগণের সকল অংশের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে। এইজন্য তাঁর প্রয়োজন হবে সমাজ সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞানও। বিপ্লবের সংগঠকদের তত্ত্বচর্চাও তাই আবশ্যকীয় কর্মসূচি। লেনিনের বক্তব্য ছিল, 'তাত্ত্বিক হিসাবে, প্রচারক হিসাবে, আন্দোলনকারী হিসাবে এবং সংগঠক হিসাবে আমাদের অবশ্যই "জনগণের সকল শ্রেণির মধ্যে যেতে হবে"। কারোর সন্দেহ নেই যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তাত্ত্বিক কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন শ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা।' (লেনিন রচনাবলি-৫, পৃ-৪২৫) শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের তাত্ত্বিক চর্চার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে লেনিন এঙ্গেলসকে উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে তত্ত্বের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ১৮৭৪ সালে এঙ্গেলস কী বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করা যাক। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহান লড়াইয়ের শুধুমাত্র দুটি রূপের কথা এঙ্গেলস বলেননি (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক)-যা এখন

আমাদের মধ্যে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি এই দুটির মতোই সমান তাৎপর্যপূর্ণ বলে তৃতীয় একটি লড়াইয়ের কথা বলেছেন-তা হলো তত্ত্বগত সংগ্রাম।' (লেনিন রচনাবলি-৫, পৃ- ৩৭০) সেখানে এঙ্গেলস জার্মান শ্রমিক নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'বিশেষ করে, নেতাদের দায়িত্ব হবে সমস্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নে আরও স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা, পুরানো বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী শব্দগুচ্ছের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে আরও বেশি করে মুক্ত করা এবং সর্বক্ষণ মনে রাখা যে সমাজতন্ত্র দাবি করে যে, যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে, এটিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ, এটিকে অধ্যয়ন করতে হবে। করণীয় কর্তব্য হবে শ্রমিক-জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনার সাথে এইভাবে অর্জিত আরও স্পষ্ট বোঝাপড়া ছড়িয়ে দেওয়া, পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয়ের সংগঠনকে আরও দৃঢ়ভাবে একত্রিত করা।' (লেনিন রচনাবলি-৫, পৃ-৩৭২)

কিন্তু বিপ্লবের স্বার্থে এই তত্ত্বচর্চার অবশ্যই একটি উদ্দেশ্যমুখীনতা থাকতে হয়। লেনিন তাঁর নিজের কর্মজীবনে এই উদ্দেশ্যমুখীনতার খুব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তত্ত্ব হিসাবে তাঁর প্রতিটি কাজই অত্যন্ত উচুস্তরের, কিন্তু প্রতিটি নিয়ে তিনি চর্চা করেছেন বিপ্লবের কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনাতেই যখন পার্টি গঠন প্রক্রিয়ার জন্য নারদনিকদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য তাত্ত্বিক বই 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' লেখেন, যা নারদনিকদের তাত্ত্বিক অবস্থানকে ধূলিসাৎ করে দেয়। আবার, অর্থনীতিবাদীরা (Economists) যাঁরা শ্রমিকশ্রেণির সচেতন অংশগ্রহণের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তত্ত্ব প্রচার করত তাদের সুবিধাবাদী দর্শনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জরুরি প্রয়োজনে লেখেন *কি করিতে হইবে* বইটি। শুধু 'ইকনমিস্ট'-দের সুবিধাবাদের উন্মোচনই নয়, শ্রমিক বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মার্কসীয় পার্টির আদর্শগত ও সংগঠনগত রূপরেখা তৈরি করেছিল এই বইটি। পার্টির সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড ও সংগঠনের গঠনতন্ত্র নিয়ে মার্তভের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের সাথে যে বিরোধ ছিল তার নিষ্পত্তির জন্যও এই বইটি অত্যন্ত জরুরি ছিল। আবার, মাখের দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে দলের অভ্যন্তরে বোগদানভ, বোজারভ, লুনাচারস্কিসহ অনেকে যখন মার্কসবাদের নামে অভিজ্ঞতা-সমালোচনাবাদী (Empirio-Criticism) মতবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন মার্কসবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে লেখেন *Materialism and Empirio-Criticism*। তিনি ছিলেন আইনের ছাত্র, এই বইটি প্রকাশ সম্পর্কে গোর্কিকে চিঠিতে লেখেন যে, তিনি নিজে মনে করতেন দর্শন তাঁর কাজ নয়। এই বই তো শুধুই দর্শন নয়, বিষয় ছিল আধুনিক বিজ্ঞানও।

তবে মনে রাখা খুবই জরুরি যে বিপ্লব কখনই জনগণের সংশ্লিষ্টতাহীন শুধুমাত্র ইনটেলেকচুয়াল কাজ না। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে কেউ কেউ এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, বিপ্লবে গরিবরা ছিলেন না, কারণ গরিবরা প্রথাগতভাবে অশিক্ষিত, বিপ্লবের মতো একটা ইনটেলেকচুয়াল ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না, ছিলও না। এমন ধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী, বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং একটা প্রতিক্রিয়াশীল অভিমত। লেনিনের বলশেভিক দলের বিরুদ্ধে তখনও এমন একটা অভিমত বিপ্লববিরোধী শক্তিগুলো পরিকল্পিতভাবে প্রচার করত, যার জবাব লেনিনই দিয়েছিলেন। শ্রমিকনেতা বাবুশকিনের হত্যার এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

খবর জানতে পারার পর তাঁর স্মরণে এবং তাঁর বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে লেনিনের লেখা একটি প্রবন্ধ আছে। ‘সোশ্যাল-ডেমোক্রেট’ শব্দবন্ধ তখনও পর্যন্ত কালিমালিগু হয়নি এবং সেই কারণে কমিউনিস্টদের কাছে ব্রাত্য হয়ে ওঠেনি, সেই সময় লেনিন মজবুত পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবুশকিনের মতো শ্রমিকদের অবদানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘কিছু মানুষ এমন রূপকথার গল্প তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি ‘ইনটেলেকচুয়ালদের’ একটি দল, শ্রমিকরা এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন, রাশিয়ার শ্রমিকরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়াই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক; বিশেষত বিপ্লবের আগে এবং বিপ্লবের সময় প্রবলভাবে এই রটনা ছিল। ১৯০৫ সালে আরএসডিএলপি বিপ্লবী গণ-সংগ্রামে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল তার প্রতি বিদ্বেষ থেকে উদারপন্থিরা এই মিথ্যাটি ছড়িয়েছিল এবং কিছু সমাজতন্ত্রী অজ্ঞতা বা দায়িত্বহীনতার কারণে এই মিথ্যা তত্ত্বটি প্রচার করেছে। এই ইক্সপলিট শ্রমিক ইভান ভ্যাসিলিভিচ বাবুশকিনের জীবন ইতিহাস এবং দশ বছরের সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ক্রিয়াকলাপ উদারবাদীদের মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেওয়ার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। আই. ভি. বাবুশকিন শ্রমিকশ্রেণির সেইসব লড়াকু সৈনিকদের মধ্যে একজন যাঁরা বিপ্লবের দশ বছর আগে থেকে শ্রমিকদের নিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি তৈরি করার কাজ শুরু করেছিলেন। যদি সর্বহারা জনগণের মধ্যে এই জাতীয় লড়াকু সৈনিকেরা অক্লান্ত এবং বীরত্বের সাথে অবিরাম কাজ না করত তবে আরএসডিএলপি দশ বছর তো দূরের কথা দশ মাসও টিকে থাকতে পারত না।’ (লেনিন রচনাবলি-১৬, পৃ-৩৬৩)

লেনিন নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত করতে যে রণকৌশল ও নীতি নিয়েছিলেন, সেখানে সোভিয়েতগুলো গড়ে তোলাটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রাথমিকভাবে এই সোভিয়েতগুলো ছিল শ্রমিকদের এবং সৈনিকদের তাঁরা কেউ ঘরে বসা বই পড়া ‘ইনটেলেকচুয়াল’ ছিল না। বলশেভিক পার্টি যে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে সেখানে সোভিয়েতগুলো ছিল বিপ্লবের হাতিয়ার instrument of revolution। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে যে কারণে বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস এবং তার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরই লেনিন স্লোগান তুলেছিলেন যে, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে-‘All power to Soviet’। জুলাই মাস পর্যন্ত অস্থায়ী কেরেনস্কি সরকার ও সোভিয়েতের দ্বৈত ক্ষমতা চলছিল তার অবসান ঘটে যখন অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার, যার অংশীদার হয়েছিলে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্টরা, বলশেভিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে, খুন এবং গ্রেপ্তার করা হতে থাকে, লেনিনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলশেভিক পার্টি পেট্রোগ্রাদে গোপনে ষষ্ঠ কংগ্রেসে মিলিত হয় (২৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট, ১৯১৭) এবং কৌশল পরিবর্তন করে ‘অস্ত্রের জোরে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সোভিয়েতদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার’ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একইভাবে অস্থায়ী সরকার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সোভিয়েতের কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ঘটনাক্রমের পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লেনিনকে সেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করেই ক্ষমতা দখলের ডাক দিতে হয় এবং বলশেভিক বাহিনী শ্বেতপ্রাসাদ দখল করে। মনে রাখতে

হবে সেই সময় অধিকাংশ সোভিয়েতের নেতৃত্বে মেনশেভিকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তা সত্ত্বেও লেনিন যে তাদের উপরই ভরসা করেছিলেন তার কারণ হলো গরিব শ্রমিকদের শ্রেণি সচেতন বিপ্লবী চরিত্রের উপর লেনিনের আস্থা ছিল।

উপরের উদ্ধৃতিতে লেনিনের যে আলোচনা তা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে এই সমস্ত তর্কিক ও ভাববাদী ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে এই সমস্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং তাকে মিথ্যা প্রমাণ করাটা আজকের দিনের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি তা না পারা যায় তাহলে গরিব মানুষের কাছে যাওয়া, আন্দোলনে তাদের সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি কষ্টকর কাজ বাদ দিয়ে সকলেই ঘরে বসে ইনটেলেকচুয়াল বাক্যলাপকেই বিপ্লবী কাজ মনে করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করবেন। যারা এমন যুক্তি করেন তাঁরা আসলে মার্কসবাদের মর্মবস্তুকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত পথের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসবে-সেই মূল বিষয়টাই তাঁরা বিস্মৃত হন।

ঠিক যে কারণে মার্কস বলেছেন, ‘পুঁজিপতি হয়ে ওঠা শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পুঁজিপতি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি সামাজিক অবস্থান’ (মার্কস-এঙ্গেলস, রচনাবলি, খণ্ড-৬, পৃ-৬৩), ঠিক সেই কারণেই সমাজতন্ত্র কোন মানুষের সদিচ্ছা নয়, এটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি যেখানে শ্রমিকশ্রেণির সচেতন অংশের কার্যকরী ভূমিকা থাকতে হয়। সমাজতন্ত্র যদি নৈতিক তাড়না বা কোন ব্যক্তির সদিচ্ছা অনুযায়ী কোন কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার বিষয় হতো, তাহলে ঘরে বসে বোদ্ধিক অনুশীলন (intellectual exercise) করলেই চলত। মার্কস-এঙ্গেলস ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখালেন কেন এবং কীভাবে বুর্জোয়ারা যে সর্বহারাদের জন্ম দিয়েছে তাঁরাই শ্রেণি হিসাবে ভবিষ্যত ইতিহাসে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের নিয়ামক শক্তি হিসাবে সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। যদি আমরা এমন একটা প্রস্তাব মেনে নেই যে বিপ্লবের সাথে এই গরিব শ্রমিকশ্রেণির কোন সম্পর্ক নেই, কিছু সং, ন্যায়বান মানুষের নৈতিক তাড়নাপ্রসূত ইনটেলেকচুয়াল কর্মকাণ্ডের উপর বিপ্লব নির্ভরশীল, তাহলে মার্কসবাদই অসার প্রমাণিত হয়। ফলে খুব সূক্ষ্মভাবেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, তাদের হত্যোদ্যম করতে, তাদের হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে এইগুলো মার্কসবাদের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পুরনো অপপ্রচার।

সমাজতন্ত্র কোন নৈতিকতার বিষয়, ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়ও নয়। কমিউনিস্ট ইশতেহারের সময় থেকেই মার্কস অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের সমালোচনা করেছেন কারণ তাদের যুক্তির আধারটি ছিল নৈতিকতা ভিত্তিক। অর্থাৎ যেহেতু রিকার্ডো দেখিয়েছেন যে, পণ্যের মূল্য সম্পূর্ণ উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয়েছে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, অতএব, তাদের বিচারে, শ্রমিক নৈতিকভাবে আরও বেশি মজুরি পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস আবিষ্কার করেছিলেন ‘শ্রমের উদ্ভূত মূল্য তত্ত্ব- যা দিয়ে তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত প্রকৃত শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উৎপন্ন সম্পদ ও আয়ের অংশের উপর মালিকের অধিকারের দাবি নৈতিক না অনৈতিক, মুনাফা ন্যায় না অন্যায়, তার সাথে মার্কসের উদ্ভূত মূল্য তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকটের স্বরূপ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে দেখিয়েছিলেন যে, মানব সভ্যতা বিকাশের

অন্যান্য স্তরের মতোই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। কারণ দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী যে কোন সত্ত্বার মধ্যেই দুই বিপরীত শক্তি থাকে, যাদের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সকল সত্ত্বার বিকাশ ঘটে। এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে লেনিন লিখেছিলেন, ‘তাঁরা (মার্কস-এঙ্গেলস) দেখিয়েছেন যে, এটি কোন একজন সক্ষম মনের ব্যক্তির যথাযথ প্রচেষ্টার বিষয় নয়, সর্বহারা শ্রেণির সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ শ্রেণিসংগ্রামই পারে মানবতাকে সমস্ত কুফল যা সমাজকে নিপীড়ন করে চলেছে তার হাত থেকে উদ্ধার করতে। ...আধুনিক সমাজের শ্রেণিগুলোর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের করণীয় হলো কোন সামাজিক শক্তির সমাজতন্ত্র আনতে অগ্রহী সেটি অনুধাবন করা এবং এই সামাজিক শক্তিটিকে তার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার অগ্রহ ও ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করা। এই বাহিনীই হলো সর্বহারা শ্রেণি।’ (লেনিন রচনাবলি-২, পৃ. ১৯-২২)

লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী একটি সংগঠিত, সুশৃঙ্খল পার্টি ছাড়া যে বিপ্লব হয় না তার প্রমাণ সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন দেশের লড়াই এবং সেইগুলোর পরিণতি লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারি। যেমন, কিছুদিন আগে শ্রীলংকার ক্ষুদ্র ও শাসকের প্রতি ক্রুদ্ধ জনতা রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল করে নিল। রাষ্ট্রপতি দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করলেন। সাধারণ প্রশাসন, সেনা প্রশাসন সব কিছুদিনের জন্য অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিপ্লব হলো না। সাধারণ জনতা রাষ্ট্রপতির খাটে গড়াগড়ি খেয়ে, সোফায় পা-তুলে বসে, সুইমিং পুলে অবগাহন করে বাড়ি চলে গেল। কারণ নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সংগঠিত পার্টি নেই, নেতা নেই, করণীয় সম্পর্কে জনতার কোন ধারণা নেই অর্থাৎ সে অর্থে তত্ত্বও নেই। সাম্প্রতিক সময়ে গাজায় যা ঘটছে তার অভিঘাত বিশ্লেষণ করলেও লেনিনের বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী তত্ত্বের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। গাজায় যা হচ্ছে তা এক বর্বরোচিত আক্রমণ বললেও কম বলা হয়, গণনিধন বললেও তাকে প্রকাশ করা যায় না। মূল আক্রমণের হোতা ইজরায়েল-আমেরিকা, আর তার যুদ্ধ জোট ইউরোপের ন্যাটো জোট, এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের জোট। দেশে দেশে মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে, বড় বড় গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে লন্ডন, নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে। কিন্তু কার্যকরীভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তেমনি, আমরা যদি এই মুহূর্তে আফ্রিকার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা দেশে সেনেগাল, বুরকানা ফাসো, কম্বো, কেনিয়া, গ্যাবন, এঙ্গোলা-ইত্যাদি প্রায় সমস্ত দেশে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের বিক্ষোভ চলছে সেখানকার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি ও নেতৃত্বকারী ভূমিকায় উপস্থিত না থাকায় অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়ল (ডিসেম্বর, ১৯৯১), প্রায় একই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের পরিকল্পনা WTO রূপায়নের পথে এগোয় (জানুয়ারি, ১৯৯৫)। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল যেন সমস্ত দেশের সম্মতিতে বিশ্বায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদিও বাস্তবে গরিব ও অনুন্নত দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অবাধ বাণিজ্যের নামে প্রতিটি দেশকে গুপ্তপ্রাচীর তুলে দেওয়া বা অতি সামান্য অঙ্কে নামিয়ে আনার অর্থ হলো প্রযুক্তিতে উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর জন্য গরিব ও অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। প্রায় একই সময়ে বিশ্বজুড়ে

তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তির World Wide Web (WWW) আবিষ্কারের (১৯৮৯) ঘটনা ঘটে, যার সূত্রে অচিরেই ইন্টারনেট, সার্চ-ইঞ্জিন গুগল ইত্যাদি প্রযুক্তির হাত ধরে তথ্য-যোগাযোগ বাণিজ্যের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে।

আবার, এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সময়েই (১৯৯২ সালে) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক চীন কমরেড মাও-এর মৃত্যুর পর একাদশ কংগ্রেস (১৯৭৭) থেকে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের হাত ধরে খুব ধীরে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি থেকে উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করেছিল ঠিকই, কিন্তু ১৯৯২ সালে এসেই তারা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বাজারের অন্যতম হিস্যাদার হিসাবে যোগদান করে। যেখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন চীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র (socialism with Chinese Characteristics) তৈরি করবেন।

এই কংগ্রেসে তাঁরা নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংস্কারের রূপরেখা কেমন হবে তা স্থির করেন। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয় যে চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তারা একটি ‘সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা’ (socialist market economic system) প্রতিষ্ঠা করবেন। দেং-এর ‘socialism with Chinese characteristics’ তত্ত্বের আড়ালে ‘poverty is not socialism’ এবং ‘to be rich is glorious’ স্লোগান প্রকৃতপক্ষে পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ অনুপ্রবেশের সূচনা করে এবং ১৯৯২ সাল থেকেই চীন আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সহযোগী হয়ে ওঠে। চীনের সাথে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ১৯৯০ সালের সূচনায় দুই দেশের আমদানি-রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৪/৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০০৬ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের একটা বিরাট বাজার পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত হয়। চীনের পার্টির বর্তমান সংবিধানে বলা হয়েছে যে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতি মূল্য ভূমিকা পালন করবে (It shall give play to the decisive role of market forces in resource allocation), সেই ঘটনার সূচনা হয়েছিল ১৯৯২ সালে চীনের চতুর্দশ কংগ্রেসে। যেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য ক্রমান্বয়ে পণ্য-বিনিময়ের ক্ষেত্র কমিয়ে এনে বাজারের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে নির্মূল করা, সেখানে বাজার অর্থনীতিকে মূল্য ভূমিকা পালন করতে দিলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক থাকে না। কাজেই চীনের পার্টি যে সিদ্ধান্ত করেছে যে দেশে শ্রেণি সংগ্রাম আর মূল দ্বন্দ্ব নয় (class struggles are no longer the main contradiction), তেমন অবস্থায় পৌঁছান ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পুঁজি থাকবে, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে, মুনাফা থাকবে, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতি মূল্য ভূমিকা পালন করবে, দেশে গণ্য গণ্য বিলিয়নিয়ার তৈরি হবে, তখন চীনের অর্থনীতি যে এখন মাওয়ার চিন্তার অনুসারী নয় তা বলাই যায়। যদিও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেসে দলের গাইড-লাইন হিসাবে একইসাথে দেং শিয়াও পিং, জিয়াং জেমিন, হু জিন তাও, শি জিন পিং এবং মাওয়ার মতবাদকে ঘোষণা করেছে। পার্টির গাইড-লাইন হিসাবে এতজনের নামকে যে অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, দলের মধ্যে সঠিক লাইন নিয়ে তীব্র মতভেদ আছে এবং এদের প্রত্যেকের অনুসারীদেরই দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাদের মধ্যে সমঝোতার জন্য সকলের নামকে যুক্ত করতে হচ্ছে।

(চলবে)

ভারতের পানি আত্মসনে উত্তরবঙ্গ কী মরুভূমি হবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সীমানা পাষ্টায় কিন্তু পানি বয়ে চলে সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই। নদী বয়ে চলে উজান থেকে ভাটির দিকে। এই যে বিষয়টি এত স্বাভাবিক সেই ব্যাপারটা নিয়ে বাংলাদেশের জন্য অস্বাভাবিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। একটু খোলাসা করে বলা যাক! ভারত বাংলাদেশের উজানে, সেখান থেকে পানি গড়িয়ে যাবে সমুদ্রে, মাঝখানে পড়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড। বাংলাদেশের উজানের ১৫ গুণ বেশি অঞ্চল জুড়ে যে বৃষ্টিপাত হয় এবং হিমালয় থেকে বরফ গলে যে পানি আসে তা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের পানে।

প্রাকৃতিক এই নিয়মকে রাজনৈতিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে বাংলাদেশের উজানের দেশ ভারত। শুধু নৈতিকভাবে নয়, আন্তর্জাতিক সব বিধিবিধানকেও তোয়াক্কা করছে না তারা। একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীকে আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়ে থাকে। সেই বিবেচনায় ভারত থেকে বয়ে আসা ৫৪টি নদীই আন্তর্জাতিক নদী। কিন্তু ভারত সেগুলোর ওপর এক বা একাধিক বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সহজভাবে কঠিন কথাটা হলো, ভারত বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত করছে এবং করেই চলেছে।

তিস্তার উজানে ভারত গজলডোবা বাঁধ নির্মাণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয় অংশে সেচের সম্প্রসারণ। এই বাঁধ দিয়ে প্রথম পর্যায়েই প্রায় ১০ লাখ হেক্টর অর্থাৎ ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় সেচ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সে জন্য ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল করা হয়েছে। এসব খাল একদিকে পশ্চিম-দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত পৌঁছেছে, অন্যদিকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা পর্যন্ত গেছে। অর্থাৎ গজলডোবা বাঁধ একটি বিস্তৃত পরিধিতে সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। এখন যে নতুন দুটি খাল খনন করা হচ্ছে, তা এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের অংশ বলেই মনে হচ্ছে। গজলডোবার বাঁধের মাধ্যমে ভারত কর্তৃক তিস্তার পানি অপসারণের কোনো উচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই। ফলে ভাটির দেশের কথা কোনোভাবেই বিবেচনায় না নিয়ে নতুন নতুন খাল খননের মাধ্যমে ভারত তিস্তা নদীর পানি অপসারণের ক্ষমতা বাড়িয়েই চলেছে। আর বাংলাদেশ অঞ্চলে তিস্তা হারাচ্ছে তার বেঁচে থাকার মতো পানি। আর তিস্তা নিজে না বাঁচলে তার অববাহিকার জীববৈচিত্র্য বাঁচবে কীভাবে?

এ যাবৎকালে তিস্তার উজানে ভারত অনেক বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ভারতের একজন প্রখ্যাত গবেষক গৌরী নুলকার দেখিয়েছেন যে, তিস্তার উজানে এবং এর বিভিন্ন উপনদীর ওপর ভারত আরও প্রায় ১৫টি বাঁধ কিংবা ব্যারাজ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এখনই তিস্তার প্রবাহ যা দাঁড়িয়েছে তারপর এগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ অংশে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার কোনো প্রবাহ যে অবশিষ্ট থাকবে না, তা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এই ভয়াবহ বিপদকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসব পরিকল্পনার বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী। অংশীদার এবং ভাটির অংশের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সম্মতি ভিন্ন এই আন্তর্জাতিক নদীর ওপর এ ধরনের হস্তক্ষেপ ভারত করতে পারে না। নদীকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতিমধ্যেই গজলডোবা বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে তিস্তা নদীর প্রবাহ শুধু যে ‘ন্যূনতম পরিবেশসম্মত প্রবাহের’ নিচে চলে গিয়েছে তাই নয়, জীবন্ত সত্তা হিসেবে



অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা কি নদী রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে না? ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার চীনের পাওয়ার চায়না কোম্পানির মাধ্যমে পরিকল্পিত, অর্থায়িত এবং বাস্তবায়িতব্য ‘তিস্তা নদী সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার প্রকল্প’ নামে একটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করছে। অনেকে এটাকে সংক্ষেপে ‘তিস্তা মহাপরিকল্পনা’ বলে অভিহিত করছেন। এ প্রকল্পের অনুমিত বাজেট প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা। লক্ষণীয়, এ ধরনের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল প্রকল্প সম্পর্কে সরকার জনগণকে কোনো কিছু জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে বলে মনে হয় না। এমনকি মুষ্টিমেয় লোকজন ছাড়া সরকারের অভ্যন্তরের বাকি লোকজনও এ বিষয়ে তেমন অবহিত নন বলে মনে হয়। জনগণের অর্থে নির্মিতব্য এবং কয়েক কোটি মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করার মতো এ ধরনের একটি প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রবণতা দুঃখজনক। এদিকে বাংলাদেশ সরকার তার নাগরিকদের প্রকল্প বিষয়ে কিছু না জানালেও, পাওয়ার চায়না কোম্পানি ইউটিউবে ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরছে। যেহেতু সরকার এ প্রকল্প সম্পর্কে কোনো তথ্য গণ-পরিমণ্ডলে প্রকাশ করেনি, সেহেতু এই প্রকল্প নিয়ে মন্তব্য বা মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে কিছু গবেষক এ প্রকল্পের পিডিপিপি এবং

নদীতে বেশি পানি থাকবে এবং তা শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, তিস্তা নদী দিয়ে এখন বছরে ৪ দশমিক ৯ কোটি টন পলি (মূলত বর্ষাকালে) প্রবাহিত হয়। ফলে খননের মাধ্যমে নদীর যে গভীরতা বৃদ্ধি পাবে, তা আবারও পলি দিয়ে ভরাট হয়ে যাবে। অন্যদিকে বর্ধিত গভীরতা কমে গিয়ে এক-তৃতীয়াংশে সরু নদী বর্ষার সব প্রবাহ ধারণ করতে পারবে না। নদী তীরবর্তী বাঁধ ভেঙে আগের প্রশস্ততায় ফিরে আসতে পারে। ফলে গভীরতা বৃদ্ধি এবং প্রশস্ততার হ্রাস কোনোটা ই স্থায়ী হবে না। ফলে তিস্তা রক্ষায় আরও কিছু বিষয় ভাবা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশের ভেতর তিস্তার ডান তীরে ৭টি এবং বাম তীরে ৫টি শাখা এবং উপনদী আছে। এগুলোর সঙ্গে তিস্তা নদীর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তিস্তার বর্ষাকালের প্রবাহ এসব নদী-নালা, খাল দিয়ে সারা অববাহিকায় বিস্তৃত হবে। শুষ্ক মৌসুমে এই সম্ভিত পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে এবং ফিরতি প্রবাহের মাধ্যমে তা তিস্তা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারবে। সুতরাং বর্ষাকালের পানি ধরে রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আশঙ্কার কথা এই যে, ইতিমধ্যেই তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় আরও দুটি খাল খননের জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ প্রায় ১ হাজার একর পরিমাণ জমির মালিকানা পেয়েছে। এ জমির মাধ্যমে তিস্তার পূর্ব তীরে দুটি খাল তৈরি করতে পারবে প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলা দিয়ে



নীলফামারী শহিদ মিনারে সমাপনী সমাবেশ

পাওয়ার চায়নার ভিডিওতে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কিছু বিশ্লেষণ উপস্থিত করছেন। সে অনুযায়ী এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, তিস্তা নদীর গড় প্রশস্ততা বর্তমান প্রায় ৩ কিলোমিটার থেকে ০.৮ কিলোমিটার (অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশে) কমানো এবং বৃহৎ খননকাজের (ক্যাপিটাল ড্রেজিং) মাধ্যমে গড় গভীরতা ৫ মিটার থেকে ১০ মিটার করা। পাওয়ার চায়নার মতে, এটি হলে নদীগর্ভ থেকে ১৭১ বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা হবে এবং তা শিল্প, উন্নত কৃষি, শহর-নির্মাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে তিস্তার গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে

বয়ে যাওয়া আরেক নদী জলঢাকার পানিপ্রবাহও খালের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সেচ বিভাগের এক সূত্রের বরাত দিয়ে গত বছর টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়, তিস্তা এবং জলঢাকার পানি টানার জন্য কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্দা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হবে। আরেকটি খালের দৈর্ঘ্য হবে ১৫ কিলোমিটার। এটি তিস্তার বাম পাশের তীরবর্তী এলাকায় খনন করা হবে। এই খালটি খনন করা হলে প্রায় এক লাখ কৃষক সেচ সুবিধার আওতায় আসবেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে

বলা হয়েছে, এ পদক্ষেপের আওতায় জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এলাকার আরও অনেক কৃষিজমি সেচের আওতায় আসবে। সাধারণভাবেই বলা যায় যে, তিস্তার পানি বাংলাদেশে না এসে চলে যাবে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এলাকায়। তাহলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ পানি পাবে কীভাবে? তিস্তার পানি দ্বারা উত্তরবঙ্গে ৯ লাখ ২২ হাজার হেক্টর কৃষিজমিকে সেচের আওতায় আনতে ১৯৭৫ সালে তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প শুরু হয়। এর আওতায় খালের মাধ্যমে তিস্তার পানি নদীর দুই পাড়ের এলাকার কৃষিজমিতে সরবরাহের পরিকল্পনা হয়। ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্য নদীগুলো থেকে খালে পানি সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শুরুর পর থেকেই প্রকল্পটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর সেচ সুবিধা বর্তমানে মাত্র ১ লাখ হেক্টরের মতো কৃষিজমি পেতে পারে। এর মূল কারণ ভারতের পানি প্রত্যাহার। শুধু পদ্মা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দা, ফেনী, সুরমা, কুশিয়ারা নয় ভারত ক্রমান্বয়ে উজানের সব নদীর পানি প্রত্যাহারের পথ ধরেছে। ফলে কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষত রংপুর অঞ্চলে মরুকরণের আশঙ্কা আর দক্ষিণাঞ্চল খুলনা সাতক্ষীরায় লবণাক্ততা প্রচণ্ড সংকটের জন্ম দিয়েছে। আশঙ্কা এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ফলে নদীর প্রবাহ শুকিয়ে গেলে জীবন প্রবাহ কি সজীব থাকবে? পানি ছাড়া যেমন জীবন বাঁচে না, নদী না বাঁচলে পরিবেশ রক্ষা পাবে না। এটা বিবেচনায় রেখে দুর্নীতি, দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এখন গুরুত্বপূর্ণ। অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করে ভারত বাংলাদেশের কৃষি, পরিবেশ, পরিবহন, পুষ্টি ও প্রাণ ধারণের ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ হুমকি তৈরি করেছে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে বন্ধুত্বের সদিচ্ছা নয়, যুক্তির সক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হবে। অভিন্ন নদীর ওপর ভারতের বাঁধ নির্মাণ, একতরফা পানি প্রত্যাহার এর বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার হতে হবে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে নদী, খাল দখল, দূষণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নদী ও ভূপৃষ্ঠের জলাশয়গুলোতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় খরা মৌসুমে সেচের জন্য এবং খাবারসহ নিত্য ব্যবহার্য পানির জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। যে পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয়, সে পরিমাণ পানি বর্ষা মৌসুমে পুনঃভরণ হয় না; তাই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে ৪৭ মিটার বা ১৪১ ফুট পর্যন্ত পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে কৃষি কাজের ব্যয় বাড়ছে। ভূপ্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে পানির প্রবাহ না থাকায় নদীর তলদেশে পলি জমে ধুঁধু বালুচরে পরিণত হচ্ছে। দেশের নৌ-পথের আয়তন ক্রমাগত কমছে, মৎস্য সম্পদ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। জলজ ও নদী তীরের উদ্ভিদ, মাছ, জলজপাখি, শিকারী পাখি, পরিযায়ী পাখি এবং অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষতি হচ্ছে। আবার বর্ষা মৌসুমে ভারত উজানের সব কয়টা সুইস গেট খুলে দেয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ও বরফ গলা পানিতে বাংলাদেশের বন্যা হয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থার অবসানকল্পে সরকারের বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ যেমন দরকার তেমনি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন। ভারত বন্ধু রাষ্ট্র একথা বলে জনগণকে প্রবোধ দেয়া এবং ভারতের কাছে নতজানু থাকার ফল এখন পর্যন্ত ভালো হয়নি। ভারত রাষ্ট্র তার স্বার্থে যেমন পানি প্রত্যাহার, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প করছে এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আমরা কেউ সমাজের দায় এড়াতে পারি না, বিপ্লবের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসুন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

নির্ধারণের প্রাথমিক কাজটি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিরাজমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা। তৃতীয়ত, এর ভিত্তিতে গড়ে উঠা দলটি লেনিনীয় নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। একটি সঠিক বিপ্লবী দলের এই মানদণ্ডগুলো থাকতে হবে।

আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতায় উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি বাংলাদেশ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, ক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণি। ফলে, সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে হবে। এই বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। পার্টি প্রক্রিয়া পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি এখানে কোন বিপ্লবী দল নেই। তাই আমরা ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদকে সঠিক মার্কসীয় লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

কেউ কেউ বাম দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, ঐক্য হওয়ার প্রক্রিয়াটা কী? এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবুও ঐক্যের এক্ষেত্রে আমাদের দলের বক্তব্য স্পষ্ট। এক পার্টি হতে হলে আমরা মনে করি যদি ধরে নেই এখানে যে কোন একটি দলের সমাজ বিশ্লেষণ, রণনীতি-রণকৌশল, পার্টি গঠন প্রক্রিয়া পদ্ধতি সঠিক তাহলে অপরাপর দলসমূহ নিজেদের দল বিশ্লেষণ করে ঐ দলের সাথে একীভূত হতে পারে। অথবা যদি মনে হয় কোনো দলই সঠিক না তা হলে সব দল বিলুপ্ত করে নতুনভাবে সকলে মিলে একটি বিপ্লবী দল লেনিনীয় নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সেটা কীভাবে হবে?। পরস্পরের চিন্তাগুলো নিয়ে আলোচনা হতে হবে। বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একমাত্র আমাদের দলই মনে করে বাংলাদেশ একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। গত ৫৩ বছর যারা দেশ শাসন করেছে তারা সবাই পুঁজিপতি শ্রেণির দল। আমরা ছাড়া অন্য কোন পার্টি এটা ঠিক মনে করে না। যদি উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা যায়, তাহলে শত্রু-মিত্র সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে না, রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণ করা যাবে না। আর শত্রু-মিত্র সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে, লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়া যাবে না। বামফ্রন্ট থাকাকালীন সময় একবার বামপন্থি দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের একটা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম পার্টিগুলো তাদের বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করুক। কিন্তু সেখানে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই আলোচনা আর এগোতে পারল না। এখনও আমরা সেই ধরনের আয়োজনে আগ্রহী। পারস্পরের মতামতের উপর শ্রদ্ধা-সম্মান রেখে সবাই নিজ নিজ মত উপস্থাপন করুক। আমরা আজকের এই সভা থেকেও একটা মতের মিথস্ক্রিয়া গড়ে তোলার আহ্বান রাখছি। আমাদের পার্টির সমাজবিশ্লেষণ রণনীতি-রণকৌশলের সাথে অন্য পার্টিগুলো একমত নয়। তা হলে কোথায় অমিল তা নিয়ে মতবাদিক সংগ্রাম হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা *দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণে বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য* এই শিরোনামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। সেখানে আমরা আমাদের সমাজ বিশ্লেষণের কথা আরেকবার সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছি। সে প্রকাশনা আমরা অপরাপর বামপন্থি দলগুলোকে দিয়েছি। কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো পার্টি এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক কোন পর্যায়েই কোনো মত দেয়নি কিংবা তাদের

পার্টি সাহিত্যেও সেটা নিয়ে কোন মতামত তুলে ধরেনি। আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন। সেখানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের ঐক্য হয় সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি আর যেগুলো নিয়ে ভিন্ন মত আছে, সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাব। সেই ভাবনা থেকে আমরা পাঁচ দল, বামফ্রন্ট করেছি। এখন বাম গণতান্ত্রিক জোট আছে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম এই জোট কাজ করতে গেলে কিছু বিষয় ঠিক করা দরকার। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট হয়েছে, তাদের একটা সাংগঠনিক কাঠামো আছে, তাদের সেক্রেটারিয়েট আছে, তাদের একজন চেয়ারম্যান আছে। আমরাও অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। আমরা বারবার এই বক্তব্যটা সামনে এনেছি। অন্যান্য দলগুলো এটাকে নীতিগতভাবে বিরোধিতা না করলেও এটাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য যে মনোযোগ একাগ্রতা প্রয়োজন তা লক্ষ্য করা যায়নি। বাম দলগুলোর ঐক্যের বিষয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে, কর্মীদেরও আগ্রহ আছে কিন্তু নেতৃত্বের দিক থেকে তাকে কার্যকর করার উদ্যোগের ঘাটতি আছে। এই কারণে এখন আমরা শুধুমাত্র ইস্যুভিত্তিক দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী? আমরা বলছি মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে—তাদের মধ্যে একদিকে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-নারী, দেশের সাধারণ নাগরিকরা ছিল এবং অন্যদিকে এখানকার বুর্জোয়ারা ছিল। তার মানে সর্বহারা শ্রমজীবী ছিল ও ধনিকশ্রেণি ছিল। ধনীরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারলে এখানকার রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বিমা ইত্যাদির মালিকানা তারা পাবে। আর শ্রমজীবীরা চেয়েছিল দেশ স্বাধীন হবে, শোষণহীন সাম্যের সমাজে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দুই শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা এক ছিল না। আবার উভয় শ্রেণি একটি বিষয়ে একমত ছিল যে—শত্রু পাকিস্তানি শাসক তাদের তাড়াতে হবে দেশ স্বাধীন করতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়ারা কুক্ষিগত করে। শ্রমজীবী-মেহনতি সর্বহারা শ্রেণির স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলছি সমাজতন্ত্রের, সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেতনা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ একটা গোষ্ঠীর ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে। রাশিয়ায় টিকলো না আমাদের দেশে কি সম্ভব। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু কেন হলো? আমরা এ বিষয়ে আমাদের মতামত লিখিতভাবে বই আকারে প্রকাশ করব। একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে সেটা হচ্ছে ফলাফল। কিন্তু তার তো একটা কারণ অবশ্যই আছে। ফলে কেউ যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে সমাজতন্ত্র কী, সেটা যেমন ভালো করে বুঝতে হবে, কেন সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই তাও বুঝতে হবে। একই সাথে কেন সমাজতন্ত্রের পতন হলো রাশিয়ায় তারও কার্যকারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তা থেকে শিক্ষা নিয়েই আজকের দিনে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে অগ্রসর করে নিতে হবে।

অনেকে বলেন, মার্কসবাদ অকার্যকর হয়ে গিয়েছে, সে মতবাদ দিয়ে আর চলবে না। এটা একটা সাধারণ বুলিতে পরিণত হয়েছে। যারা এ কথা বলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন কী দিয়ে হবে? কিন্তু কেউ তো নতুন কোনো দিশা দেখাতে পারছেন না। আমরা যারা মার্কসবাদী তারা জানি মার্কসবাদ হচ্ছে ‘বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ’ করে স্ব স্ব দেশের আলাদা বাস্তবতার আলোকে সেখানে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হয়, বিপ্লব

করতে হবে। আমরা কখনও বলিনি রাশিয়া বা চীনের মতো করে বাংলাদেশে বিপ্লব হবে।

মার্কসবাদ হচ্ছে গতিশীল দর্শন। বিজ্ঞান যেমন এক জায়গায় থেমে থাকে না, তেমনি বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনও এক জায়গায় থেমে থাকে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র, উৎপাদন পদ্ধতি, এখানকার মানুষের মন-মানসিকতা, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য, সংগ্রাম ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। তাতে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ঘাটতি-দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যখনই ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে পারছি তখনই তার থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করছি। আমাদের এই সংগ্রাম দলের অভ্যন্তরে যেমন চলছে, একইভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম অব্যাহত আছে।

কমরেড ও বন্ধুগণ, আমাদের এই মিলনমেলায় শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ বয়স্ক মানুষ অংশগ্রহণ করে। এবছর প্রচণ্ড দাবদাহ, গরমের কারণে অনেকে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এখানে দলের বাইরের অন্য দল, কোনো দলে সরাসরি যুক্ত নয় এমন অনেক মানুষও অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ পার্টির সাথে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। অনেকে এবারই প্রথম আমাদের এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে দলের সাথে যুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এঁরা আমাদের দলের সাথে কাজ করতে চায়। সমাজতন্ত্রের প্রতি এদের আগ্রহ আছে। তারা আমাদের পত্রিকা, পুস্তিকা পড়ে দল সম্পর্কে জেনে দলের সাথে যুক্ত হওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তারা পার্টির কাছে নির্দেশ চাচ্ছেন কীভাবে তাদেরকে পার্টি কাজে লাগাবে।

আমাদের পেশাজীবী সংগঠনসমূহকে সক্রিয় করে এই সমস্ত মানুষকে কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। পার্টির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান রাখছি আমাদের এই পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য মনোযোগী হতে।

গবেষণা সেল গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। আমাদের অবশ্যই গবেষণা সেল গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়েও গবেষণা সেল ছিল। বুর্জোয়া দলগুলোরও গবেষণা সেল আছে। আমরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কোন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, কোন ধরনের কর্মকাণ্ডে কারা অংশগ্রহণে আগ্রহী ইত্যাদি বিষয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার। এব্যাপারে আমাদের কমরেডদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যারা এ কাজে সহযোগিতা করতে পারবেন স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন। আশাকরি অচিরেই আপনারদের সহযোগিতা নিয়ে পার্টির গবেষণা সেলের যাত্রা শুরু করতে পারবে।

একটা বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বহারা সাহিত্য লাগবে, যার মধ্যদিয়ে দলের নেতাকর্মী এবং সমাজের নানা অংশের মানুষকে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। পার্টি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমরা অপরাপর বামপন্থিদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে আছি কিন্তু চাহিদার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ইস্যুতে আমাদের বক্তব্য থাকতে হবে। কিছুদিন আগে পিকেটির একুশ শতকের পুঁজি নামে একটা বই প্রকাশ হয়েছে, সেটা নিয়ে বিশ্বের সকল দেশে আলোচনা চলছে। বইটি বাংলা অনুবাদও হয়েছে। এর পরও আরও দুটি বই প্রকাশ হয়েছে। যেই লেখা নিয়ে এত আলোচনা সেই বক্তব্যের সাথে তো আমাদের পরিচিত হতে হবে। সেখানে কী বলতে চাইছে, তার কতটা যৌক্তিক কতটা

অযৌক্তিক সেগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। সাগর মছুন করে যেমন মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আমাদেরও জ্ঞান সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশ এক ভাষাভাষীর রাষ্ট্র তাই বাংলায় প্রকাশনা হলেই দেশের সকল মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বামপন্থি দলগুলো কাজ করছে তাদের বক্তব্য, কর্মকাণ্ড এগুলো জানাবুঝার জন্য আমাদের অন্যান্য ভাষা জানতে হবে। একইভাবে আমাদের প্রকাশনাগুলোও বিভিন্ন ভাষায় অন্তত ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। তা হলেই আমরা যেমন অন্যদের সম্পর্কে জানতে পারবো তেমনি আমাদের বক্তব্য-ভাবনা, কর্মকাণ্ডও অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারব, এজন্য আমাদের একটা অনুবাদ সেলও গড়ে তুলতে হবে।

এখন বাংলাদেশে বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে যে সর্বহারাশ্রেণির আন্দোলন জোরদার করার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। মানুষ আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএপির কথা ভাবে কিংবা বিএনপির বিপরীতে আওয়ামী লীগ। বস্তুত দেখতে হবে আওয়ামী লীগ-বিএনপির বিপরীতে বামপন্থিরা। এই সমীকরণে রাজনীতিকে দাঁড় করাতে হবে। অর্থাৎ বুর্জোয়া লুটেরার বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণি। সর্বহারার সাংগঠনিক শক্তি যত বড়বে বুর্জোয়ার শক্তি তত কমবে।

এখন ফিলিস্তিনে গণহত্যা চলছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে। ইরানের সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করছে ইসরায়েল, ইরান হামলা করেছে ইসরায়েলে আবার ইসরায়েল হামলা করেছে ইরানে। অনেকগুলো দেশে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদ আছে মানে যুদ্ধ ছাড়া সে টিকে থাকতে পারে না। তার অর্থনীতি এখন যুদ্ধ অর্থনীতি। তাই সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুদ্ধ থাকবে, যুদ্ধমোদনা থাকবে। কখনও বিশ্বযুদ্ধ হবে কখনও আঞ্চলিক যুদ্ধ হবে। সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে না পারলে দুনিয়া থেকে যুদ্ধ যাবে না। আগে ছিল এক দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্য দিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। গত কয়েক দশক ছিল এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা এখন আবার তার কয়েকটি কেন্দ্র হয়েছে। আজকে বাংলাদেশে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আজকে বাসদ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছে। আমরা ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের ছাত্র সংগঠন জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ স্থাগিত রাখা ও পর্যালোচনার দাবিতে সংগ্রাম করছে। স্কুল শিক্ষা নিয়ে জুলাই মাসে ছাত্র কনভেনশন হবে। সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চ শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। আজকে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে।

শ্রমিক ফ্রন্ট মজুরির আন্দোলন, গণতান্ত্রিক শ্রম আইনসহ শ্রমিকদের সংকট-সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছে। বিভাগীয় শহরে মজুরি কনভেনশন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কৃষক-কৃষি ও দেশ বাঁচানোর আন্দোলন করছে। মহিলা ফোরাম নারী নির্যাতন বন্ধ ও অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে। নানা পর্যায়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। **অ্যাড. আখতার কবির চৌধুরী** বলেন, প্রগতিশীল নামধারীরা এখন রাজাকার-মৌলবাদের জুজুর ভয়ে আক্রান্ত। পূর্বে দেশের নানা সংকটে যারা প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিলেন তারা অনেকে আজ স্বার্থ-সুবিধার লোভে নিশ্চুপ। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দল ক্ষমতায় থাকার পরও মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা কমেছে। দেশে আজ দূর্নীতি-লুটপাট সীমাহীন। সিভিল সোসাইটি প্রতিবাদহীন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

মেট্রোরেল ভাট আরোপের প্রক্রিয়া বন্ধ কর, রেলের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার কর-বাসদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা তা না বুঝতে পারার কারণে রাজনীতিতে ও নির্বাচনে টাকার খেলায় তারা দর্শক হয়ে পড়ছেন। ফলে প্রতারণা, জালিয়াতি অথবা কারসাজি যে কোন প্রকারে নির্বাচন করে ক্ষমতাসীনরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

বাংলাদেশ সম্ভবত একমাত্র দেশ যে দেশে সরকারিভাবে দাম ও ভাড়া বাড়ে না। এখানে হয় মূল্য সমন্বয় আর ভর্তুকি প্রত্যাহার। কিন্তু ঐ যে আমরা জেনেছি, গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন সে গোলাপ। তেমনি সরকার যাই বলুক না কেন, আম জনতা দেখছে দাম বাড়ছে, ভাড়া বাড়ছে। এবার তারা তা প্রত্যক্ষ করবেন রেল এবং মেট্রোর ভাড়ার ক্ষেত্রে। রেলের ভাড়া বেড়েছে গত ৪ মে থেকে আর মেট্রোরেল ভাট আরোপ শুরু হবে জুলাই থেকে।

নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও রেলওয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পছন্দের ও নির্ভরযোগ্য বাহন। অধিক যাত্রী বহন করতে পারার কারণে রেলকে সহজ, সস্তা এবং পরিবেশসম্মত বাহনও বলা হয়ে থাকে। রেলের ক্ষেত্রে তো বটেই সারা বিশ্বেই সব ধরনের পরিবহনে বেশি দূরত্বের ভ্রমণে উৎসাহী করতে ছাড় দেওয়া হয়। বাংলাদেশেও রেলে ১৯৯২ সাল থেকেই বেশি দূরত্বের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু পথে ভাড়া ছাড় দেওয়া হতো। ২০১২ সালে রেলের ভাড়া গড়ে ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়। ২০১৬ সালে আরেক দফা সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভাড়া বাড়ানো হয়। তবে বেশি দূরত্বে ভ্রমণের রেয়াত বহাল ছিল।

রেলে প্রতি কিলোমিটারে ভিডি ভাড়া ৩৯ পয়সা। এর সঙ্গে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) ও অন্যান্য উচ্চ শ্রেণির বিভিন্ন হারে ভাড়া, ভাট যোগ করে মোট ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এখন থেকে ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে বাড়তি ভাড়া যোগ হবে। এর ফলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, শোভন শ্রেণির ভাড়া বাড়বে ৬০ টাকা। এসি স্লিপার শ্রেণির ভাড়া ১২১ টাকা আর এসি (বার্থ) ভাড়া বাড়বে ২১৬ টাকা। ঢাকা কুড়িগ্রাম শোভন চেয়ারে ভাড়া ১৩৫ টাকা বেড়ে ৬৪৫ টাকা, এসি চেয়ারে ২৬৫ টাকা বেড়ে হবে ১ হাজার ২৩৭ টাকা। এমন করে সব রুটেই ভাড়া বাড়বে এবং বাস আর ট্রেনের ভাড়া প্রায় সমান হয়ে যাবে। ফলে রেল যাত্রী হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে এবং লোকসান বাড়তে থাকবে।

পরিবহন হিসেবে ঢাকা মহানগরের মানুষের আগ্রহ ও পছন্দের তালিকায় এখন মেট্রোরেল। যানজটের ঢাকা, গণপরিবহণ হিসেবে ট্রেন না থাকা এবং লক্কর ঝক্কর বাস এর বিপরীতে মেট্রোরেল কিছু মানুষের কাছে একটি স্বস্তির বাহন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যে কারণে ভাড়া বেশি হলেও মানুষ মেনে নিচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে মেট্রোকে বিলাসী পরিবহণ হিসেবে দেখিয়ে (যেহেতু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) এর উপর ১৫ শতাংশ ভাট আরোপ করা হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, মেট্রো কী তাহলে গণপরিবহন হিসেবে থাকছে না, বাণিজ্যিক পরিবহণে পরিণত হতে যাচ্ছে?

১৮২৪ সালে রেল চালু করার পর পৃথিবীর প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়েছিল লন্ডনে, ১৮৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি। বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত মেট্রোরেল ব্যাপক ধোঁয়া তৈরি করলেও সেই সময়ে তা জনপ্রিয় হয়েছিল। এরপর মেট্রোরেল বিদ্যুৎ যোগ হয় ১৮৯০ সালে এবং ধোঁয়াবিহীন ও গতিময় মেট্রো লন্ডন নগরবাসীর কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর ৬২টি দেশের ১০৬টি শহরে মেট্রো রেল চালু আছে, সর্বশেষ হিসেবে বাংলাদেশের পর নাইজেরিয়াতে ২০২৩ সালে মেট্রো রেল চালু হয়। সময়ের হিসেবে লন্ডনে মেট্রোরেল চালুর ১৫৯ বছর ১১



মাস ১৮ দিন পর গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকায় চালু হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল। শুরুতে ঢাকা মেট্রোরেল চলেছে উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত। এখন চলছে মতিঝিল পর্যন্ত। ২০২৫ সালে চলবে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত।

মেট্রোর মাধ্যমে ঢাকার এক অংশের মানুষের চলাচলে একটু স্বস্তি পাওয়ার জন্য শুধু ঢাকাবাসী নয় সারাদেশের জনগণকেই আর্থিক দায় নিতে হচ্ছে। এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল এই গণপরিবহন নির্মাণে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণ ব্যয় হয়েছে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারণের জন্য আরও ব্যয় হবে ১১ হাজার ৫১৪ কোটি টাকা, মোট ৩২ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকার প্রকল্প এটি। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি জাইকা থেকে ৭৫.৪৫ শতাংশ টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে ঢাকায় যখন মেট্রোরেলের কাজ শুরু হয়, তখন খোঁড়াখুঁড়ি করার ফলে রাস্তা সর হয়ে যায়। বর্ষায় কাদাপানি ও জলজট, শীতে ধূলাবালু আর সারা বছর যানজট। পাঁচটি বছর মানুষের ভোগান্তির কোনো শেষ ছিল না। সেই ভোগান্তির শেষ হয়েছে মেট্রোরেল উদ্বোধনের মাধ্যমে। এখনো মানুষ মেট্রোরেল চড়তে, দেখতে স্টেশনগুলোতে ভিড় করছে। মানুষের যাত্রা স্বস্তিদায়ক হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে আশঙ্কাও জন্ম নিচ্ছে মেট্রো কি আর্থিকভাবে সহজ পরিবহণ থাকছে না?

মেট্রোরেল গণমানুষের গণপরিবহন না হয়ে সচলদের পরিবহন হয়ে উঠছে কি না এই প্রশ্নের কারণ এর ভাড়া। মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ভাড়া ২০ টাকা। এর মানে হলো, মিরপুর ১০ নম্বর সেকশন থেকে উঠে কাজীপাড়ায় নামলে কিংবা সচিবালয় স্টেশনে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নামলে একজন যাত্রীকে ২০ টাকা দিতে হয়। অথচ বাসে এই দূরত্ব ১০ টাকা দিয়েই যাওয়া যায়। আর উত্তরা থেকে কমলাপুর যেতে ভাড়া লাগে ১০০ টাকা। বাসের ক্ষেত্রে যা ৫০ টাকা।

মেট্রোরেলের প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ টাকা। ঢাকায় বাসভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২ টাকা ৪৫ পয়সা। মেট্রোরেল তিন ফুটের কম উচ্চতার শিশুদের ক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়া হবে না। সাধারণত তিন বছর বয়স হলেই শিশুর উচ্চতা তিন ফুট হয় ফলে তাদের ভাড়া দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য মেট্রোরেল ছাড় নেই। বাসে শিক্ষার্থীরা অর্ধেক ভাড়া দিয়েই চলাচল করে। ঢাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর আগে (২ ডিসেম্বর ২০২১) সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বাসমালিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে হাফ ভাড়ার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করুন।' এক বছর পর মেট্রোরেল উদ্বোধনের আগে সংবাদ সম্মেলনে সড়কমন্ত্রী বলেন, মেট্রোরেল কোনো

হাফ ভাড়া নেই। বাসমালিকদের উদ্দেশ্যে যে সংবেদনশীলতার কথা তিনি বলেছিলেন, সরকারি মেট্রোরেলের ক্ষেত্রে তা দেখা গেল না। মিরপুরের পল্লবী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী যদি মেট্রোরেল চড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চান, তাহলে তাঁর ভাড়া দিতে হবে ৬০ টাকা, আসা-যাওয়ায় ১২০ টাকা। মাসে তাঁর ব্যয় হবে ৩ হাজার টাকার বেশি। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও বেশি ব্যয় হবে।

উল্লেখ্য, বাসে হাফ ভাড়ার বিষয়টি চালু হয় স্বাধীনতার আগে। ১৯৬৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি ঘোষণা করেছিল, তার অন্যতম ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য গণপরিবহনে হাফ ভাড়া চালু করা।

মেট্রোরেলের ভাড়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মেট্রোর চেয়ে বেশি। যেমন. কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের উত্তর-দক্ষিণ করিডরের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ রপি (৬ টাকা ২ পয়সা)। এই ভাড়া দিয়ে দুই কিলোমিটার যাওয়া যায়। আবার ২০ কিলোমিটারের বেশি যেতে ২৫ রপি (৩১ টাকা) লাগে। পূর্ব-পশ্চিম করিডরের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ রপি, সর্বোচ্চ ৩০ রপি (৩৭ টাকা), যা দিয়ে ভ্রমণ করা যায় ১০ থেকে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেট্রোরেল কলকাতার তুলনায় তিন গুণ ভাড়া বাংলাদেশে।

পাকিস্তানের লাহোরে ২০২০ সালে চালু হয়েছে মেট্রোরেল (অরেঞ্জ লাইন), যার দৈর্ঘ্য ২৭ কিলোমিটার। অরেঞ্জ লাইনে সর্বনিম্ন ভাড়া ছিল ৪০ রপি (১৮ টাকা)। সম্প্রতি দূরত্বভিত্তিক ভাড়া ঠিক করেছে প্রাদেশিক সরকার। এখন সর্বনিম্ন ভাড়া ২০ রপি (৯ টাকা), সর্বোচ্চ ৪০ রপি (১৮ টাকা)। অর্থাৎ লাহোরের মানুষ ১৮ টাকা দিয়ে ২৭ কিলোমিটার পথে ভ্রমণ করতে পারে। দিল্লির মেট্রোরেলের ভাড়া বেশ কম। প্রথম দুই কিলোমিটারের ভাড়া ১০ রপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ টাকার সমান। আর ২১ থেকে ৩২ কিলোমিটার ভ্রমণে ভাড়া ৫০ রপি (৬২ টাকা)।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় মেট্রোরেলের ভাড়া বাংলাদেশের চেয়ে কম। জাকার্তায় সরকারি গণপরিবহনব্যবস্থার সমন্বিত ভাড়া কার্যকর আছে। এর মধ্যে মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে সর্বনিম্ন ভাড়া আড়াই হাজার রপিয়া, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬ টাকার মতো। আর কিলোমিটার প্রতি ভাড়া ২৫০ রপিয়া (১ টাকা ৬৪ পয়সা)। জাকার্তার মেট্রোরেল প্রবীণ, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়।

কুয়ালালামপুরে ৫০ রিজিট ব্যয় করে পুরো মাস শহরজুড়ে চলা গণপরিবহন ব্যবহার করা যায়, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ১৬৩ টাকা। এই গণপরিবহনের মধ্যে মেট্রোরেল, বাস র্যাপিড ট্রানজিট ও বড় স্টেশনের সঙ্গে সংযোগকারী (ফিডার) বাস সেবা রয়েছে। ফলে মাসে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ২০০ টাকার কম ব্যয়ে সারা মাস শহর জুড়ে চলাচল করা যায়।

মেট্রোরেল এমন একটি গণপরিবহন, যেটি

কখনো যানজটে পড়বে না, গরমে আরামদায়ক, দ্রুত গতির, নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছার নিশ্চয়তা আছে। রাজধানীর একাংশের মানুষ তাই খুশি। এই আপাত খুশিকে ব্যবসার হাতিয়ার বানিয়ে গণপরিবহনের চরিত্র ধ্বংস করে তাকে বানিজ্যিক পরিবহণ বানানোর চেষ্টা খুবই নিন্দনীয়।

ঢাকায় যারা গাড়িতে চড়েন, একা সিএনজিতে চড়েন, তাঁদের জন্য মেট্রোরেল শত্রু। কিন্তু তাঁরা রাজধানীর কত শতাংশ এবং কেমন আয়ের মানুষ? জাইকার এক সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজধানীর মানুষের ৬৭ শতাংশই বাস ও মিনিবাসে চলাচল করেন। দেখা যায় বাসে বাড়তি ভাড়া নিয়ে ঝগড়া, মারামারি হয়। কারণ, দুই টাকা, পাঁচ টাকাও তাঁদের কাছে অনেক কিছু। তাঁদের কাছে মেট্রোরেল বিলাসিতা। যদিও মেট্রোর জন্য ঋণের দায় তারাও বহন করবেন। ভাট আরোপ হলে ভাড়া বাড়বে ফলে মেট্রো আর তাদের জন্য সহজলভ্য বাহন হবে না। বিপুল ব্যয়ে তৈরি মেট্রো রেল যার ঋণের বোঝা বহন করবেন সাধারণ মানুষ, ভাড়া বৃদ্ধির কারণে সেই বাহন আর সাধারণ মানুষের থাকবে না।

রেলের লোকসান নাকি বছরে দুই হাজার কোটি টাকা। ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে রেয়াত বাতিল করে বছরে ৩০০ কোটি টাকা বাড়তি আয় হবে। মেট্রো রেলে প্রতিদিন নাকি লোকসান দেড় কোটি টাকা। ভাট আরোপ করে আয় বাড়বে বছরে ৭৯ কোটি টাকা। ফলে এই ভাড়া বৃদ্ধি করে জনগণের কাঁধে বোঝা চাপালেও তো লাভ হবে না যদি লোকসানের কারণ বন্ধ করা না যায়। দুর্নীতি, অপচয় এবং লুণ্ঠনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হবে, ব্যয় বৃদ্ধির কারণে লোকসান হবে আর লোকসানের দায় চাপানো হবে জনগণের উপর। প্রতিবাদ না করলে লুটপাটকারীরা জনগণের উপর সিদ্ধাবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসবে। সব খেয়েও যাদের খিদে কখনো মিটেবে না। জনগণের পক্ষের রাজনীতি শক্তিশালী না করে এই দুষ্ট চক্র কোনভাবেই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

বাসদের বিক্ষোভ সমাবেশ

মেট্রোরেল ১৫ শতাংশ ভাট আরোপের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া চালু ও মেটা প্রকল্পের দুর্নীতি, লুটপাট বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৭ এপ্রিল ২০২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ কমরেড নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সদস্য খালেকুজ্জামান লিপনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, ঢাকা নগরের সদস্য জাকির হোসেন, রুখশানা আফরোজ আশা, ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে মেট্রোরেলকে ভ্যাটের আওতা এনেছে। কিন্তু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান কর অব্যাহতির সুবিধা পাচ্ছে। 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক'-দেখিয়েছে দেশে কী পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো, রেস্টুরেন্টস, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক, বহুজাতিক কোম্পানি, ধনী ব্যক্তির ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে আর এনবিআর-এর দৃষ্টি মেট্রোরেলের যাত্রীদের উপর। আর ট্রেনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা না কমিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে লোকসান কমানোর ভুল চেষ্টায় কোনো ফল আসবে না।

আমেরিকায় উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয় : গণহত্যা ও জায়নবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিলিস্তিনের স্বাধীন ভূমি দখল করে আগ্রাসী তৎপরতা ও গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। আর এই দীর্ঘসময় ধরেই এই হত্যাযজ্ঞে সমর্থন ও সহযোগিতা করে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে গত অক্টোবর মাস থেকে যেন গণহত্যার সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ২০০ দিনের আগ্রাসনের পর গত (২৩ এপ্রিল পর্যন্ত) সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে ৩০২৫টি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৭৮০টি শিশু রয়েছে। সাত হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। মোট ৭৬ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। বেশির ভাগ বেসামরিক অবকাঠামো তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। এর মধ্যে গাজার ৭০ শতাংশ বাড়িঘর, ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৬টির মধ্যে ৩৩টি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। আর অধিকৃত পশ্চিম তীরে ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল সেনাবাহিনী ও অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালিয়ে ৪৮৬ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছেন, আহত করেছেন ৪ হাজার ৭০০ জনের বেশিজনকে। গাজার পরে নেতানিয়াহ সরকার এখন হুমকি দিচ্ছে ফিলিস্তিন অধ্যুষিত রাফাহতেও তারা হামলা করবে।

এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যেই গত এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখ নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে তাঁরু গেড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে দেশটির অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিক্ষোভ চলছে। এরপর বিক্ষোভ শুরু হয় ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, ভারত ও লেবাননের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিক্ষোভকারীরা গাজার হামলা বন্ধের পাশাপাশি ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে ও অস্ত্র সরবরাহ করে, এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ত্যাগের দাবি জানাচ্ছেন। যুদ্ধহীন একটা শান্তির পৃথিবীর স্লোগান তারা তুলছেন। যে যুক্তরাষ্ট্রে জায়নবাদবিরোধী কোনো ভাষ্য উপস্থাপন করা ছিল বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেটি করতে শিক্ষার্থীরা যে সাহস, মানবিকতা, সৃষ্টিশীলতা ও দৃঢ়তা দেখিয়ে চলেছেন তা অভাবনীয়। ষাটের দশকে ভিয়েতনামে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছিল এখনকার এই বিক্ষোভ সে ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিদ্যাপীঠ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে শিক্ষার্থীরা গাজার ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে সারা দুনিয়া এটা

দেখল যে, গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার ছবক দেয়া মার্কিন প্রশাসন বর্বর কায়দায় শিক্ষার্থীদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুধু পুলিশ কিংবা দাঙ্গা পুলিশ নয়, পুলিশি প্রহরায় জায়নিস্ট গুন্ডাদের দিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থীকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন হুমকি দিচ্ছে যারা এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হবে বলে। লস এঞ্জেলস এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তাঁরু গুড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রাণঘাতী নয় এমন থ্রেনেড ছোড়া হয়েছে,

মাটিতে পড়ে গেলে পুলিশের এক সদস্য তাঁকে হাঁটু দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। পরে দুই হাত পিছমোড়া করে তাঁকে হাতকড়া পরানো হয়। এই হচ্ছে মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী আমেরিকার আসল গণতান্ত্রিক (!) চেহারা। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং এই আন্দোলনে নাকি ইহুদি বিদ্বেষ এবং এন্টি সেমেটিক উপাদান আছে! একটা জাতিকে নিঃশেষিত করে ফেলা হচ্ছে, বোমা মেরে হাজার হাজার নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষকে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। তাদেরকে চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলা হয়েছে। আর এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে সেটা ইহুদি বিদ্বেষ!

নিউইয়র্কের মেয়র বলেছেন, ‘এটা একটা বৈশ্বিক ইস্যু। একে পুঁজি করে বহিরাগত

শাসকশ্রেণি যতই এ আন্দোলনকে নস্যাত্ত করার জন্য হীন পরিকল্পনা করুক না কেন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই এই ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। যেমন করে আমেরিকার প্রতিটি ক্যাম্পাস থেকে ছড়িয়ে এই বিক্ষোভ এখন ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপে, আফ্রিকায় এবং এশিয়ায়। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ইউনিয়ন শিক্ষার্থীদের উপর এই দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। ছাত্রদের আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের একাত্মতারও এক নজির স্থাপন করল এই আন্দোলন। আর এভাবেই ছাত্র-শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই হয়তো পথ দেখাবে শুধুমাত্র যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে নয় গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নতুন সমাজ গড়ার লড়াইয়েরও।



কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে গুলি ছোড়ার ঘটনাও। ছোড়া হচ্ছে পিপার স্প্রে এবং সাউন্ড থ্রেনেড। বাইডেন প্রশাসনের এই জঘন্য বর্বর হামলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে ৫০ জন শিক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছেন। বিক্ষোভ চলাকালে এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর পাঁজরের ৯টি হাড় ও একটি হাত ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। মিজোরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইসে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী শিক্ষক স্টিভ তামারি সাউদার্ন ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটি এডওয়ার্ডসভিলের ইতিহাসের অধ্যাপক। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রেপ্তারের সময় অধ্যাপক স্টিভ তামারি

একদল সুযোগসন্ধানী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানুষ আমাদের শিক্ষার্থীদের উত্তেজিত করছে। আমরা এটা চলতে থাকতে দিতে পারি না। এটা নিশ্চিতভাবেই আমাদের শিক্ষার্থীদের চরমপন্থার দিকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ এই বৈশ্বিক সমস্যা হচ্ছে গোটা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মোড়লদের জন্য। আর যে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে আজ শিক্ষার্থীরা দাঁড়াচ্ছে, যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছে এটাই এই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষে পরিণত করবে। আর এই বিক্ষোভের অন্তরালের বহিরাগত উচ্ছানিদাতা খোঁজার দরকার নেই, গোটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার নৃশংসতাই এর জন্য যথেষ্ট কারণ নয় কি?

ধর্ম যাই হোক নিপীড়ন ও যুদ্ধ লাগানোর ক্ষেত্রে শাসক-শোষকরা এক। তারা চরিত্রে পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী—তাদের প্রধান লক্ষ্য ব্যবসা আর মুনাফা। গোটা পৃথিবীকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে তাদের দ্বিধা নেই। ফলে মানবিক বোধে তাড়িত হয়ে যে মানুষ প্রতিবাদে নেমে এসেছে, পুলিশের নির্যাতন সহ্য করছেন তারা একথা অবশ্যই মনে রাখবেন এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অবসান না ঘটলে মানুষের জীবন নিরাপদ হবে না।

গাজার মানুষের বাঁচার লড়াই তাই বিশ্বের মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের প্রতিক হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে সেই লড়াইয়েও যুবকরাই সাহসের সাথে এগিয়ে আসবেন।

বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দ দাও কৃষক-খেতমজুরদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আহ্বান

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস ২ মে ২০২৪ সংবাদপত্রে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনের ৪০তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে সারাদেশের কৃষক-খেতমজুর-গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৮৪ সালের ২ মে বাংলাদেশের গরিব-মাকারী কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায় ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে কৃষক-খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনগতভাবে এবং জোটভুক্ত সংগ্রামে কৃষক ফ্রন্ট নিয়োজিত রয়েছে। কৃষক-খেতমজুরদের ন্যায়সংগত দাবিতে এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১



আমরা কেউ সমাজের দায় এড়াতে পারি না, বিপ্লবের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে আসুন

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রকাশনা সংস্থা মৌলবাদী শক্তি ও বিদেশি নানা গোয়েন্দা সংস্থা দখল করছে। কোন

কোন প্রকাশনা সংস্থা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার কালচারাল সেন্টারে পরিণত হয়েছে। কিশোরদের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট করাতে পারলে তথাকথিত কিশোর গ্যাং সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হবে।

অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী বলেন, ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে আমার বাসদের সাথে সম্পর্ক। এই মিলনমেলায় আমি প্রতি বছর আসি। আজ দেশে যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে তা ভেঙে ফেলতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নতি দেখে লজ্জিত। আর আমরা দেশের অভ্যন্তরে থেকে হাসিনার শাসনব্যবস্থা দেখে লজ্জিত। বামপন্থিদের ভাঙ্গন তাদের শক্তি ক্ষয় করেছে।

রুহিন হোসেন খ্রিষ্ট : আপনারা যারা সারা দেশ থেকে এসেছেন, যদি আপনারদের কথা শুনতে পারতাম তা হলে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা সহজ হতো। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন এটাই তো আমাদের কথা। মানুষকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যদি রাস্তায় নামাতে পারি সেটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। মানুষ বর্তমান অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না এর পরিবর্তন চায়। বামপন্থিদের করণীয় হলো এই দুর্বিষহ অবস্থার প্রাচীর ভেঙে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা সকল বামপন্থিদের ও শ্রমিক-কৃষককে লড়াইয়ের ময়দানে নামাতে পারলে সেটাই হবে আমাদের মুক্তির পথ।

কবি মোহন রায়হান বলেন, আমি স্বার্থ-সুবিধার প্রত্যাশায় নিশ্চুপ থাকাদের কাতারের নই, কখনো কলমে কখনো কণ্ঠে আমি প্রতিবাদে আছি। কিন্তু এক সময় আমি জানতাম জীবন কেন দিতে হবে, কার জন্য দিতে হবে। কিন্তু এখন জানি না। বাসদ সঠিক ধারায় লড়াই-সংগ্রামে আছে বলে মনে করি। তাই বাসদ ডাকলে আমি আসি।

সুলতানউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমি স্বপ্ন দেখি বাসদসহ বামপন্থি দলগুলো একসাথে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে, আর আমরা তাতে शामिल হব। আমরা যারা এই লড়াইয়ে যুক্ত হতে চাই আমাদের জন্য বাসদ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করবে আশা করি। সেটা পাঠচক্র ধরনের উদ্যোগও হতে পারে।

ভারতের পানি আগ্রাসনে উত্তরবঙ্গ কী মরুভূমি হবে?

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

তেমনি পানি আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশকে চাপের মধ্যে রাখতে চাইছে। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেমন পানি পাওয়ার অধিকার রাখে তেমনি উজানের দেশ হিসেবে নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতের বাঁধ-ব্যারেজ, খাল তৈরি করে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার চেষ্টা করাও অনৈতিক। আন্তর্জাতিক ফোরামে এই বিষয়ে জোর প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নদী ও পানি সম্পদের উপর ভারতের আগ্রাসন প্রতিরোধের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে, আগ্রসনের ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। এই নদী আগ্রাসনে আমাদের কৃষি, শিল্প, ভূপ্রকৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীববৈব্র্যি, মৎস্য ও প্রাণীজ সম্পদ, উদ্ভিদসহ বড় পরিসরে ক্ষতি হচ্ছে এবং আগামী দিনে বাংলাদেশ যে আরও ভয়াবহ হুমকির মধ্যে পড়বে তার বিরুদ্ধে এই জনপদ রক্ষা করতে এ আন্দোলনে সফল হওয়ার কোন বিকল্প নাই। তিস্তাকে বাঁচানো আমাদের বাঁচার স্বার্থেই প্রয়োজন। দেশের মানুষেরও প্রতিবাদ

ড. আব্দুল লতিফ মাসুম বলেন, বাংলাদেশের শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য আপনারা কাজ করেন তাই আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং সাথে প্রত্যাশা আছে। দেশের মুক্তিকামী মানুষ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। **অধ্যক্ষ আজিজুল হাসান** বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, পার্টির শিক্ষা আমাকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শিখিয়েছে, তাই পার্টির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি এখন অবসর জীবনে আছি। পার্টির নির্দেশনায় আমি প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম এবং বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চে ভূমিকা রাখতে চাই। যেখানেই থাকব দলের জন্য কাজ করতে চাই।

কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ বলেন, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারত নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। আজকে যে অত্যধিক তাপমাত্রা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও ভারত দায়ী। ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তার উজানে বাঁধসহ নদ-নদীতে বাঁধ দিয়ে তারা আমাদের শুকিয়ে মারছে। দেশের অর্থনীতিতে লুটপাট, দুর্বৃত্তায়নের জন্য দায়ী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধাচ্ছে, গাজায় হত্যাकाণ্ড চালাচ্ছে। দেশে এখন ফ্যাসিবাদী শাসন চলছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন অতিষ্ঠ। আওয়ামী সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। মানুষ বিকল্প হিসেবে বামপন্থিদের শক্তি দেখতে চায়, তাদের ঐক্যবদ্ধ দেখতে চায়। **নাসিরউদ্দিন আহমেদ নাসু** বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলছেন। দিনের ভোট রাতে, আমি এবং ডামির নির্বাচন করেছে। দেশে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন চলছে। আমাদের বামপন্থিদের, লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করতে হবে, মিশন নিয়ে এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

অ্যাড. শাহীন বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্য দরকার। ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক ধারণা থেকে বের হয়ে এসে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিশ্বমানবের সমাজ নির্মাণের ডাক বাসদ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম বলেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে মানুষের চেতনার অবক্ষয় হয়েছে। আমাদের রাজনীতিবিদরা জনগণের ভাষা বুঝতে পারছে না, আবার জনগণের ভাষাকে

রাজনীতির ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না। আমাদের আমিত্ব বর্জন করতে হবে, বাসদকে নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে। আজকের যুব সমাজকে সোশ্যাল মিডিয়া আবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু বিপরীতে কেউ কেউ সমাজ-দেশ নিয়ে ভাবছে। বামপন্থিদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঐক্যের ভিত্তি নির্মাণ করুক এবং সাথে সাথে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করুক এই প্রত্যাশা করি।

অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, প্রত্যেক জাতির নিজেদের রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতনতা দরকার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা দরকার। সোভিয়েত ব্যবস্থার ভাঙ্গন, চীনের মাও পরবর্তী নীতি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের হতাশা তৈরি করেছে। গণঅভ্যুত্থান হঠাৎ করে হয় না তার জন্য ধারাবাহিক পূর্ব প্রেক্ষাপট থাকে।

ডা. শহিদুল্লাহ সিকদার বলেন, আজকে আদর্শ ধরে এগিয়ে যাওয়া কঠিন, কারণ দেশকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাসদ কখনই আদর্শের প্রশ্নে আপস করেনি, এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বামপন্থিরা বিভক্ত হয়ে আছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাসদের প্রত্যেক কর্মীকে এক একজন জনগণের নেতা হয়ে উঠতে হবে। আজ জাতিকে পথ দেখানোর মানুষ দরকার।

ড. সামসুল হোসেন বলেন, আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য, শত্রু-মিত্র পরিষ্কার হতে হবে। এক সময় সমাজতন্ত্রের কথা দেশের সব জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু এখন নেই। সমস্যা আছে অনেক, কিন্তু তৃণমূল নেতারা হয় সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে পারছেন না, নয় তো তাদের তৈরি করা যাচ্ছে না। আমরা এগুচ্ছি, না পেছাচ্ছি মূল্যায়ন করা দরকার।

ব্যারিস্টার ফারহা খান বলেন, বাসদের এত সুন্দর, সুশৃঙ্খল প্রোগ্রামে অংশ নিতে পেরে আমার ভালো লেগেছে। আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

মেহের নিগার চঞ্চল বলেন, আমি যখন বাসদের সক্রিয় কর্মী ছিলাম তখন অনুষ্ঠিত পাঠচক্র থেকে রাজনীতির অনেক কিছু শিখেছি। শোষণ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনারা আমাকে পাবেন।

কমরেড আব্দুল আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা বলা হয় সেটা আমার কাছে

ভাসাভাসা। ’৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আর মানুষের মুক্তির যুদ্ধের চেতনা কী এক? মূলত সমাজতন্ত্রের চেতনাই মানুষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, এই বিষয়টা মানুষের কাছে পরিষ্কার করা দরকার। আমরা সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতায় যেতে চাই, দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই এটা মানুষের কাছে স্থাপন করতে পারছি না। বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বাসদ ও সিপিবিকে ভূমিকা নিতে হবে।

অ্যালবার্ট রিপন বন্ড বলেন, বরিশালের মানুষ বাসদকে ভালোবাসে। লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাসদ মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছে।

জিএম ফারুক বলেন, পার্টির লড়াই-সংগ্রামের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। বিভিন্ন সময়ে নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে দল আজ সংহত অবস্থায় আছে।

অধ্যাপক আবিদুর রেজা বলেন : আমি মনে করি সমাজ পরিবর্তিত হবে, হচ্ছেও। এখন বিশ্বের নানা দেশে চলছে নব্য দাস প্রথা। আমাদের দেশের যুবসমাজ কাজের জন্য বিদেশে যায়, সেখানে তাদের জীবন দাসের মতো। আমি ডেনমার্কে দেখছি ওখানে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কত কঠিন সামাজিক পরিবেশে জীবনযাপন করে দেশে রেমিটেন পাঠায়। মালয়েশিয়ায়ও একই অবস্থা দেখেছি। শ্রমিকদের একত্রিত করার কাজটা কঠিন। সমাজের সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এগুতে হবে।

রাশিদুল হাসান : আমি ছিলাম একজন সরকারি চাকরিজীবী। বাসদের কর্মীরা তাদের সাংগঠনিক প্রচারের জন্য বিভিন্ন জাগায় যায়, সেভাবেই তাদের সাথে আমার পরিচয়। তখন বাসদের নেতা-কর্মীদের সাথে কথা শুনে তাদের প্রকাশনা পড়ে মনে হয়েছে এদের ওপর ভরসা রাখা যায়। সেখানথেকেই আমি আপনারদের শুভানুধ্যায়ী। আমি বাসদের এই ধরনের আয়োজনের অপেক্ষায় থাকি। কারণ এখানে আসলে কিছু সং-নিষ্ঠাবান মানুষের দেখা পাই। যারা মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবে, সাধ্যানুযায়ী কিছু করার চেষ্টা করে। তাদের সাথে আগামী সময়ও আমার সম্পর্ক থাকবে, কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব।

সভার সভাপতি কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ উপস্থিত সূধীজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিলনমেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তিস্তামার্চের সমাবেশ শহরের সাত মাথায় বাসদ বগুড়া জেলা শাখার সদস্যসচিব অ্যাড. দিলরুবা নূরীর সভাপতিত্বে ও নাটোর জেলার সমন্বয়ক দেবাশীষ রায়ের পরিচালানায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড নিখিল দাস, সিপিবি জেলা সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ফরিদ, বাসদ নওগাঁ জেলার আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, রাজশাহী জেলার আহ্বায়ক আলফাজ হোসেন যুবরাজ। সমাবেশ শেষে শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এর পর তিস্তামার্চের সমাবেশ জেলার মোকামতলা, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি, রংপুরের মিঠাপুকুর ও শহরের লালবাগে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলার সমন্বয়ক গোলাম রব্বানী, বাসদ পলাশবাড়ীর সভাপতি আলীউল ইসলাম বাদল, সিপিবির সভাপতি আব্দুল্লাহ আদিল নান্নু, সাধারণ সম্পাদক সাজু মাস্টার, বাসদনেতা মমিনুল ইসলাম, সাইফুজ্জামান টুটুল, নাসির উদ্দীন খ্রিষ্ট, ছাত্র ফ্রন্টের সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম।

রংপুর, নীলফামারী : ২৩ এপ্রিল তিস্তামার্চের

তৃতীয় দিন সকাল ১০ টায় রংপুর পায়রাচত্বরে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এর পর তিস্তামার্চের বহর পাগলাপীর, জলঢাকা, চৌপথি, তিস্তা ব্যারে হয়ে ডিমলা শহিদ মিনারে সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশসমূহে বাসদের রংপুর জেলা আহ্বায়ক আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, জয়পুরহাট জেলা আহ্বায়ক অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সিরাজগঞ্জ জেলা আহবায়ক নবকুমার কর্মকার, নওগাঁ জেলা আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন মুকুল, বগুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নুরী, নাটোর জেলা সমন্বয়ক দেবাশীষ, নীলফামারি জেলার নেতা ইউনুস আলী, রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সদস্য অমল সরকার, গাইবান্ধা জেলা সদস্য লিপি আক্তার, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীন প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ পানিসম্পদ রক্ষার আন্দোলন জোরদার করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দলের কর্মী-সমর্থক ও দরদিরা নীতিনিষ্ঠ থেকে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও সময় পার্টি কাজে ব্যয় করবেন দুঃসময়ের অসহনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে ব্রতী হবেন



ভাঙ্গা ফরিদপুর



ঝিনাইদহ



যশোর



মাগুরা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সর্বস্তরের সৎ-সুধীজনদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান

কমরেড খালেকুজ্জামান

বাসদে কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান গত ১২-১৪ এপ্রিল '২৪ ফরিদপুর, যশোর, ঝিনাইদহ ও মাগুরায় সাংগঠনিক সফর করেন। এসময় তিনি যশোরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পুনর্মিলনীতে যোগ দেন এবং ফরিদপুর, ঝিনাইদহ এবং মাগুরায় বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যক্তিবর্গ ও দলের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনটি সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সভাসমূহে বাসদ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জনার্দন দত্ত নাট্ট, সদস্য শফিউর রহমান শফি ও প্রকৌশলী সম্পা বসু ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ওসমান আলী।

ছাত্র ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার পুনর্মিলনী ১৩ এপ্রিল '২৪ শহরে 'প্রাচ্যসংঘ আকাদেমি' অডিটোরিয়ামে প্রকৌশলী নুরজ্জামানের সভাপতিত্বে ও প্রাক্তন ছাত্র ফ্রন্ট নেতা মতিয়ার রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্মিলনীতে আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক কমরেড শাহজাহান আলী, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ি, প্রাক্তন ছাত্র ফ্রন্ট নেতা নাজির উদ্দীন, শামসুর রহমান, রেজাউল হক, রমেশ চন্দ্র বাইন ও ফজলুর রহমান।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষার অধিকার আদায়ে ও শাসকদের শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে

সংগ্রামে ছাত্র ফ্রন্টের চার দশকের ইতিহাস ছিল সংগ্রামমুখর, গৌরবোজ্জ্বল ও নীতিনিষ্ঠ। ছাত্র ফ্রন্ট ছাত্রসমাজের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষক, নারী-শিশুসহ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায় এবং দেশের সম্পদ রক্ষায়, স্বাভাবিক বিরুদ্ধে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের আত্মসী নীতি, যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে ও দেশের মানুষের প্রতিটি আন্দোলনে মানুষের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র ফ্রন্ট আগামী দিনে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। ছাত্র ফ্রন্ট দেশের বিরাজমান সংকট সমাধানে মানুষের সংগ্রামে যেমন থাকবে তেমনি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে বাসদের সাথে থেকে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করবে।

জোন-৭ (বৃহত্তর ফরিদপুর) : ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় ভাঙ্গা কোর্ট পাড় ওরিয়েন্ট ক্লাব ও পাঠাগারে জোন-৭ এর সমন্বয়ক অধ্যক্ষ মোশায়েদ হোসেন ঢালীর সভাপতিত্বে নাগরিকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন ভাঙ্গা উপজেলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সিপিবি সংগঠক জনাব সুধীন সরকার, সিপিবি সংগঠক সুভাষ চন্দ্র মন্ডল, প্রভাষ কুমার মালো, অ্যাডভোকেট ইকরাম আলী সিকদার, অধ্যাপক ছরোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক সংগঠক এ্যাপোলো নওরোজ, কবি গৌরাঙ্গ সাহা, বাসদ ফরিদপুর জোনের সদস্যসচিব সৈয়দ আলী মোল্লা, সদস্য অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, মাহমুদা হোসেন, কৃষিবিদ কিশোর আহমেদ, ছাত্র ফ্রন্টের প্রাক্তন নেতা প্রীতিলতা, জয়া আহমেদ, মাহমুদ হাসান তুহিন, সজীব, মালিহা, আদিতা চারু, স্মৃতি আহমেদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন।

যশোর : ১৩ এপ্রিল যশোর জেলা শাখার উদ্যোগ 'দেশের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতি

ও বামপন্থীদের করণীয় শীর্ষক' সুধী সমাবেশ ও মতবিনিময়সভা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিকফেডারেশন জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, সিপিবি জেলা সভাপতি আবুল হোসেন, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সমন্বয়ক হাসিনুর রহমান, কমিউনিস্ট লীগের জেলা সভাপতি জিল্লুর রহমান ভিটু, অ্যাড. আমিনুর রহমান হিরু, অধ্যক্ষ পাভেল চৌধুরী, অধ্যাপক ইসরাফিল হক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বাসদ যশোর জেলা শাখার আহ্বায়ক শাহজাহান আলী।

মাগুরা : বাসদ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল স্থানীয় রেডিয়েন্ট স্কুলে জেলা আহ্বায়ক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাম গণতান্ত্রিক জোট জেলার সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, গণকমিটি মাগুরা জেলার আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ জাসদ জেলা সভাপতি এটিএম মহব্বত আলী, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কামরুজ্জামান চপল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হাকিম বিশ্বাস, জাসদ জেলা সহসভাপতি ওহিদ কামাল বাবলু, রেডিয়েন্ট স্কুলের পরিচালক, সাংবাদিক ও তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুত বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি জেলার সদস্যসচিব শরীফ তেহরান টুটুল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম মাগুরা জেলা শাখার সভাপতি হিরালাল কর্মকার লোহার, সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ বাগদি, বাসদ কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য অধ্যক্ষ মোশায়েদ ঢালি। আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি ওসমান আলী, মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মাহমুদা হোসেন, সদস্য খাদিজা বেগমসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি

পেশার মানুষ।

ঝিনাইদহ : ১৪ এপ্রিল সকাল ১০ টায় জেলা বাসদ কার্যালয়ে কর্মীসভা জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদের সভাপতিত্বে ও জেলা সদস্য মামুন হোসেন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শফিউর রহমান শফি, জেলা বাসদ সদস্য ডা. আব্দুল মান্নান, আছাদুর রহমান, মমিনুর রহমান, রবিনা খাতুন, শারমিন সুলতানা প্রমুখ। কর্মীসভায় বাসদ, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন।

এসব মতবিনিময় সভায় কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, দেশের বর্তমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, লুটপাটের অর্থনীতি, গণতন্ত্রহীনতা, প্রহসনের নির্বাচন ব্যবস্থা, বাকস্বাধীনতা হরণ, কালো আইনের দৌরাভ্য, আকাশ-পাতাল ধনবৈষম্য, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসসাধন, শ্রমিক-কৃষকের অধিকার হীনতার এই অবস্থা দেখে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, গণতন্ত্রকামী, শিক্ষিত-সচেতন, প্রগতিশীল বিবেকবান মানুষেরা মর্মান্বিত। এখন মানুষ মুক্তির দিশা খুঁজছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সর্বনাশা যাত্রা স্বাধীনতার পরেই শুরু হয়ে আজকের বাংলাদেশের ঠিকানায় হাজির হয়েছে। ইতিহাসের এটাই শেষ নয়। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা ধারণকারী প্রকৃত বামপন্থী শক্তিকে শক্তিশালী করে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম বেগবান করতে হবে। দেশের আপামর শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের স্বার্থে দেশপ্রেমিক শক্তিকে একত্রিত হয়ে সকল অপশক্তিকে রুখতে হবে। আপনাদের বাসদের সংগ্রামে शामिल হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, ন্যায্য মজুরির লড়াইকে সমাজবদলের লড়াইয়ে পরিণত করুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন, রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের নেতা দাউদ আলী মামুন, মহিলা ফোরামের দপ্তর সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, ছাত্র ফ্রন্ট-এর সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

শ্রম আইনে ও শ্রমিকের জীবনে মে দিবস

আজ থেকে ১৩৮ বছর আগে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ নয়, ৮ ঘণ্টা কাজ-এই দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন অগাস্ট, স্পাইজ, এঞ্জেলস, ফিসার। মালিক এবং সরকার ভেবেছিল ফাঁসি দিয়ে শ্রমিক নেতাদের হত্যা করে শ্রমিকদের ভয় দেখানো এবং আন্দোলন দমন করা যাবে। কিন্তু ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা শ্রমিকদের এই আন্দোলন হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করা যায়নি। বরং আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর দেশে দেশে। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের নেতৃত্বে ‘দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেস’-এ প্রতিবছর ১ মে আন্তর্জাতিক বিস্ফোদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯০ সালের নিউইয়র্কে প্রথম মে দিবসের সমাবেশের প্রস্তাবে লেখা হয়, ‘৮ ঘণ্টা কাজের দিনের দাবি পূরণের সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব কিন্তু কখনো ভুলব না, আমাদের শেষ লক্ষ্য হলো (পুঁজিবাদী) মজুরিব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন’। তারপর থেকেই ৮ ঘণ্টা কাজ, ন্যায্য মজুরি আর সমাজবদলের সংগ্রাম একসঙ্গেই চলছে।

মানুষ প্রতিদিন যা কিছু ব্যবহার করে সব কিছুই মানুষের শ্রমে তৈরি। শ্রমিক কাজের বিনিময়ে মজুরি পায় আর মালিক শ্রমিককে কাজ করিয়ে মুনাফা অর্জন করে। কার্ল মার্কস হিসাব করে দেখিয়েছিলেন কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় আর মালিক তা শোষণ করে। মালিকরা শ্রমিকের মজুরি যত কম দেবে এবং যত বেশি সময় কাজ করাবে, তাদের মুনাফা ততই বাড়বে। তাই ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে যে লাখ লাখ শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তারা চেয়েছিল এমন মজুরি, যাতে সে মানসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারে, সন্তানদের

লেখাপড়া করাতে পারে, অসুখে চিকিৎসা, মাথা গোজার ঠাঁই নির্মাণ, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে।

কারণ, ন্যায্য মজুরি না পেলে যতই পরিশ্রম করুক না কেন শ্রমিকের জীবনে স্বস্তি আসবে না। মাস শেষে মজুরি পেতে না পেতেই বাড়ি ভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করে বাকি মাস চালাতে আবার দেনা করা, এই চক্র চলতেই থাকে। যেহেতু শ্রমিককে শোষণ করেই মালিকের মুনাফা হয়, তাই শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে ন্যায্য মজুরি আদায় করা সম্ভব হয় না। মজুরি বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি যেন হাত ধরাধরি করেই চলে। ফলে, ন্যায্য মজুরির আন্দোলন করতে গেলে শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবেই আর স্বপ্ন দেখতে হবে শোষণহীন সমাজের।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে ৬ শতাংশের বেশি, মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ আর পাশাপাশি শ্রমিকের মজুরি বাড়ে ৫ শতাংশ হারে। ফলে প্রতিবছর শ্রমিক মজুরি হারায়। সরকারি মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৭৯৫ ডলার। ১১৫ টাকা ডলার ধরলে ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক আয় ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা হওয়ার কথা সেখানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ, পৃথিবীর বহুদেশ বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রশংসা করছে। এসব কথা আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রতিদিন শুনি। কিন্তু বাংলাদেশের এই উন্নতির পেছনে প্রধান শক্তি যে শ্রমিক তারা এত কম মজুরি কেন পায় সে প্রশ্নের উত্তর কী? পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা শ্রমিক আর মালিক-শ্রমিকের বিশাল বৈষম্যের দেশ এই বাংলাদেশ। গার্মেন্টস-নিট, সুয়েটার-রি রোলিং, পাট-চা, তাঁত, যানবাহন চালকসহ পরিবহন শ্রমিক, মোটর মেকানিক, রিকশা চালক, দোকান ও হোটেল কর্মচারী, পাদুকাসহ সব সেক্টরের শ্রমিকরা মানসম্পন্ন জীবনযাপনের মতো মজুরি থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত মিলে ৭ কোটি ৩৬ লাখ শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করেও নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে পারছে না, অন্যদিকে কয়েক লাখ কোটিপতির জীবনে বিলাসিতার শেষ নেই। শ্রমিকদের শোষণ করেই তাদের এই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকরা সচেতন হলে এই অন্যায় শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রাম করবেই, সে কারণে শ্রমিকদের

ট্রেড ইউনিয়ন করার পথে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। শ্রম আইন-বিধিমালা, প্রশাসন-পুলিশ, মাস্তান, শ্রমিকনেতা নামধারী একদল দালালকে ব্যবহার করে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত হতে বাধা দেয়। কারণ তারা জানে, শ্রমিকরা সংখ্যায় যত বেশি হোক না কেন অসংগঠিত থাকলে তারা দুর্বল ও অসহায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অনেক বেশি উৎপাদন করা যায়, ফলে শ্রমিকের কর্মঘণ্টা কমানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। শ্রমিকের মজুরি এত কম দেওয়া হয় যে, আট ঘণ্টা তো বটেই, ওভারটাইম না করলে তাদের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন। ১৩৮ বছর আগে শ্রমিক দাবি করেছিল আট ঘণ্টা কর্ম দিবসের আর আজ শ্রমিক ওভার টাইম করতে চায়। এর কারণ নিহিত আছে স্বল্প মজুরির ফাঁদে। মজুরি কম বলে সে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায় না আর দক্ষতা কম বলে তার মজুরি কম। এ এক দুষ্ট চক্রে আটকা পড়েছে শ্রমিক।

শ্রম আইন শ্রমিকের জন্য অধিকারের সুরক্ষার পরিবর্তে অধিকার কেড়ে নেওয়ার আইনি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম শক্তির ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি ২৫ লাখ শ্রমিক শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এরা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক। তাদের ক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা, মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, মাতৃ তৃকালীন ছুটি ও আর্থিক সহায়তা কোনো কিছুই নেই। শ্রম আইনে আছে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ছাড়া কোনো শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। এই আইনের প্রয়োগ সেখানে নেই। ফলে এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাইরেই রয়ে গেছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যাদের সংখ্যা ১ কোটি তারাও আইনের বেড়াডালে আটকে আছে।

শ্রম আইনের ১০০ ধারায় উল্লেখ আছে কর্ম সময় হবে ৮ ঘণ্টা কিন্তু ১০৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে ১০ ঘণ্টাও কাজ করানো যাবে। শ্রম আইনের ২৩ ধারা ব্যবহার করে অসদাচরণের অজুহাতে বিনা নোটিশে, বিনা মজুরিতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। শ্রম আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী যেকোনো স্থায়ী শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা যাবে। আবার ১৮০ ধারায় আছে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়া যাবে না। শ্রম আইন

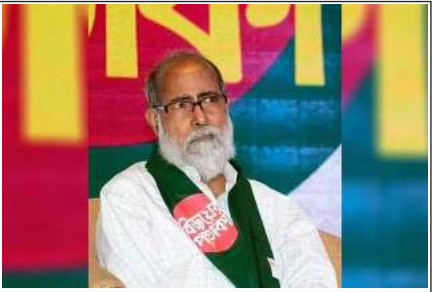
অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ মাত্র ২ লাখ টাকা। আর চিরস্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করলে ক্ষতিপূরণ মাত্র আড়াই লাখ টাকা।

ফলে সংসারের দায় পালন করতে এসে দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে শেষে সংসারের বোঝা হয়ে যাচ্ছে শ্রমিক। ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অধিকার এবং হাতিয়ার। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত লাখ লাখ শ্রমিক অসহায়ের মতো নিপীড়ন সহ্য করে যদি তারা সংগঠিত না থাকে। বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ অনুস্বাক্ষর করেছে ১৯৭২ সালে। সে অনুযায়ী সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং দরকষাকষি করার অধিকার পাওয়ার কথা। এই অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানেও স্বীকৃত। কিন্তু এখনো শ্রম আইন সংবিধান ও আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী প্রণীত হয় নাই। সে কারণে ৭ কোটি ৩৬ লাখ শ্রমজীবীর মধ্যে মাত্র ৩২ লাখ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আর প্রায় ২ লাখ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে। ফলে সদস্য সংখ্যা এবং ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কোনোটা ৫ শতাংশের বেশি নয়। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের এবং মালিকদের নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকায় তা শ্রমিক স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

কিন্তু মে দিবস এই শিক্ষা দেয়—শ্রমিকের দাবি যতই ন্যায্য হোক না কেন, লড়াই করা ছাড়া তা আদায় করা যায় না এবং অর্জিত অধিকার রক্ষাও করা যায় না। মালিক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে দয়া বা করুণা চেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, ন্যায্য মজুরি আর ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে হলে সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার-আশুলিয়া, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঝিনাইদহ, যশোর, শার্শা, অভয়নগর, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর, কামারখন্দ, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, খুলনা, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জসহ, দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং শ্রমিক ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও ক্রাফট ফেডারেশনসমূহ লালপতাকা মিছিল-সমাবেশ, র্যালি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে মে দিবস পালন করে।

জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৯ এপ্রিল ২০২৪ গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য দেওয়া এক বিবৃতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, একই সাথে তাঁর শোক সন্তুষ্ট পরিবার, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার শিল্পী ছিলেন শিব নারায়ণ দাস। যে পতাকা ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্রদের পক্ষে উত্তোলন করেন

তৎকালীন ডাকসুর ভিপি ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব। মুক্তিযোদ্ধারা সময় এই পতাকা হাতে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছিল। স্বাধীনতার পর পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দিয়ে লাল-সবুজের পতাকাটিই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শিব নারায়ণ দাস ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের স্বাধীনতাকামী রেডিক্যাল অংশের সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বরণ্য দেশপ্রেমিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে হারালো।

উল্লেখ্য, ২০ এপ্রিল তার মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেদুজ্জামানসহ নেতৃবৃন্দ। এছাড়া পুষ্পমাল্য অর্পণ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে রানা প্লাজা হত্যা দিবস পালিত

রানা প্লাজা হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের আইন সংশোধন এবং সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবি নিয়ে ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা হত্যাকাণ্ডের ১১তম বর্ষে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে জুরাইন করবস্থান ও সাভারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সমাবেশ ও মিছিল করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট।

এসব কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, গার্মেন্টস

শ্রমিক ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সহসম্পাদক ইমাম হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপন, আবু নাজিম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ প্রমুখ। এছাড়া গাজীপুরের সালনা বাজার এলাকায়সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ, মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।



প্রসঙ্গ বুয়েট : ছাত্র রাজনীতিই কি বলির পাঠা?

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগ। যে কারণে ক্যাম্পাসে বিরাজ করছিল বিরোধী মতাবলম্বী সংগঠনের শূন্যতা। ফলে বাম প্রগতিশীল রাজনীতির এই শূন্যতা ও ছাত্রলীগের একচ্ছত্র আধিপত্য ও সম্ভ্রাসের বলি হতে হয়েছে আবরার ফাহাদকে। তাই আবরার হত্যার পরপরই শিক্ষার্থীরা যে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সেই আন্দোলনের মধ্যে সম্ভ্রাস-দখলদারিত্ব বিরোধিতা ছিল প্রবল।

বর্তমানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে, ছাত্ররা মনে করে ছাত্রলীগ করলে হলে থাকার সুযোগ পাওয়া যায়, ডাইনিং ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া যায়, ক্যাম্পাসে বুক ফুলিয়ে হাঁটা যায়, সহপাঠীদের উপর কর্তৃত্ব ফলানো যায়, নানা ধরনের আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়, শিক্ষা শেষে চাকরি মেলে এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যেও নানা রকম সুযোগ তৈরি হয়। একদিকে যৌবনের উন্মাদনা অন্যদিকে সুবিধার হাতছানি। ফলে ক্ষমতার মদমত্তায় বেপরোয়া হয়ে উঠার সুযোগ তৈরি হয়। এই পরিবেশে একটি সাধারণ পরিবার থেকে আসা ছাত্র অনেকের জীতির কারণ হয়ে উঠে। আর এদেরকে পরিচালনাকারী ছাত্রলীগ নেতারা এতটাই ক্ষমতাস্বপ্ন হয়ে ওঠে যে ভাইস চ্যান্সেলর থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পর্যন্ত সবাই তাদেরকে সম্ভ্রষ্ট রাখার চেষ্টা করে। এর ফলাফল হিসেবে নির্মাণকাজের ঠিকাদারি, কেনাকাটায় এরা হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং মনে করে এটা তাদের অধিকার। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের কমিশন নিয়ে টেলিফোনের আলাপের কথা ফাঁস হয়েছিল। এই ঘটনা শাসক দলকে এতটাই বিব্রত করেছিল যে, তারা ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পদচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু চাঁদাবাজির প্রবণতা বন্ধ করতে পারেননি। ফলে পরবর্তীতেও নানা ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বাস্তবে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যা দেশে এমন কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, যেখানে ছাত্রলীগের ক্ষমতার দাপট দেখায় না, বিরোধী মতকে দমন করে না এবং বিচিত্র সব অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হয় সম্পৃক্ত থাকে অথবা সহায়তাকারী হিসেবে থাকে। কিন্তু দায় চাপে শুধু ছাত্র সংগঠনের উপর। যেমন জাহাঙ্গীরনগরের কমিশনবিষয়ক কেলেঙ্কারিতে যেমন তৎকালীন উপাচার্যের নাম ছিল, তেমনি চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর হাতে নিহত ছাত্রলীগের আরেকজন নেতা দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডে একজন প্রক্টরের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ছিল। এ ছাড়াও গণরুমে নির্যাতন, গেস্ট রুম সংস্কৃতি, র‍্যাগিংসহ নানা ঘটনায় এবং ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অকালে প্রাণ হারানোর ঘটনাও আছে। সমালোচনা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে সম্ভ্রাসীরা কোন দলের তো নয়ই তাদের দলেরও নয় কিন্তু ছাত্রলীগের ক্ষমতার আধিপত্য ধরে রাখার লড়াইয়ে মৃত্যুর মিছিল থামেনি।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সকলেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা উল্লেখ করেন। এই অতীত ইতিহাস হলো অধিকার প্রতিষ্ঠা তা ভাষা, শিক্ষা, স্বাধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস, শাসকদের শিক্ষা সংকোচনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস। দেখা গেছে শাসকদলের অনুসারীরা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে সবসময় আর ছাত্রদেরকে লড়তে হয়েছে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের গুন্ডামি আর পুলিশের নিপীড়নের বিরুদ্ধে। যেমন আইয়ুব খানের আমলে এনএসএফ এবং খোকা পাঁচ পাত্তর এর গুন্ডামি, স্বাধীনতার পর ডাকসুর ব্যালট ছিনতাই, মহসিন হলের ৭ ছাত্র হত্যা, সামরিক শাসকদের ক্ষমতায় থেকে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দখল করার চেষ্টা করা সব কিছুকেই মোকাবিলা করেছে গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো আর এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনা আর অধিকারবোধ অর্জিত হয়েছে ছাত্র সমাজের মধ্যে। কিন্তু আনুগত্য আর অধিকারবোধ পরস্পর বিপরীত। তাই যারা আনুগত্য চায় তারা ছাত্র আন্দোলনের এই চরিত্রকে কলুষিত করার চেষ্টা করে নানা অনৈতিক সুবিধার জাল বিছিয়ে। ফলে লড়াই সংগ্রামে অর্জিত ছাত্র রাজনীতির সংগ্রামী ধারাকে শাসক শ্রেণির দলসমূহের দ্বারা কলুষিত হয়ে এসেছে বারবার। এদের সম্ভ্রাস, দখলদারি মনোভাব, গায়ের জোরে ভিন্নমতকে দমিয়ে রাখা এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে নির্যাতন, হাত পায়ে রগ কাটা ও নিহত হওয়ার ঘটনা দেখে ছাত্র রাজনীতি ও সম্ভ্রাসকে একাকার করে ফেলেছে সাধারণ ছাত্রদের অনেকে। একারণেই ছাত্র রাজনীতির প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে অনেকেই বলছেন ছাত্র রাজনীতি চাই না। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে তাদের মূল ঘৃণা সম্ভ্রাস চাঁদাবাজির প্রতি আর আকৃতি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পরিবেশ পাওয়ার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পরিবেশ বলতে কি তারা চিন্তার স্বাধীনতা, বিতর্ক করার পরিবেশ, যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশকে মনে করেন না? অবশ্যই তা মনে করেন কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কাছে তা পাওয়া যাবে বলে ভরসা করেন না।

ফলে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে যখন ছাত্রলীগ কথা বলছে তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে সাধারণ ছাত্ররা। এতোদিন নীরব থেকে কেন তারা ঘটা করে ক্যাম্পাসে গেল তার কারণ হিসেবে সামনেই বুয়েটে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হবে সে কথা বলছে অনেকে। অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই বুয়েটের এসকল উন্নয়ন প্রকল্পে নিজেদের ভাগ-বাটোয়ারা নিশ্চিত করতেই ছাত্রলীগের বর্তমান এই তৎপরতা বলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতির উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চালুর দাবি, হাইকোর্টের রায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের খবর এক সূত্রে গাথা কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

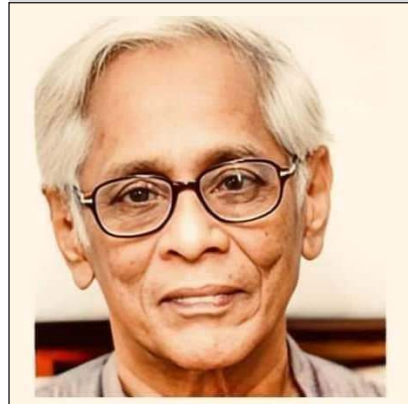
এখন সবাই বলছেন, ছাত্ররাজনীতির গুণগত মান ধসে গিয়েছে, দলীয় লেজুড়বৃত্তি থেকে ছাত্র রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে ইত্যাদি তারা নিশ্চয়ই ছাত্রদেরকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা মনে করেন না। সমাজে বাস করে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হবে না এতো হতে পারে না। হয় সে সমাজের প্রচলিত চিন্তাকে গ্রহণ করবে নতুবা নতুন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ পাল্টানোর সংগ্রাম করবে এর বাইরে আর কোন অবস্থান তো থাকতে পারে না। ফলে ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি কেমন হবে তা নির্ধারিত হয় কোন মতাদর্শের ভিত্তিতে সে সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছে তা দ্বারা।

প্রতিটি রাজনৈতিক দল কোন না কোন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। আওয়ামীলীগ যে রাজনীতি করছে, তা হলো পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। এটা করতে গিয়ে আর ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে যে নির্বাচন তারা করছে তার প্রভাব কি তাদের ছাত্র সংগঠনের উপর পড়ে না? পড়ে। সে কারণেই ক্যাম্পাসগুলিতে ভিন্ন মত ও দলের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন ও প্রতিবাদহীন পরিবেশ বজায় রাখা ছাত্র লীগের রাজনীতি। শিক্ষা নীতি, শিক্ষা কারিকুলামসহ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের দাবি নিয়ে আন্দোলন তাদের কাজ নয় বরং কোন আন্দোলনকে দমন করার

উদ্দেশ্যেই তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে। আর এর বিপরীতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, শিক্ষা সংকোচনসহ ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ আপামর মানুষের সংকট নিরসনের দাবিতে পরিচালিত রাজনীতি অর্থাৎ শোষণ-বৈষম্যহীন বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি কি কেউ করবে না? কেউ কি বলতে পারবে না, যেভাবে দেশ চলছে তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়? বিশ্ববিদ্যালয় পড়া মুখস্ত করানোর প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো ছাত্র সমাজকে প্রশ্ন করতে শেখানো। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার মানুষকে প্রশ্ন করতে দেয় না। বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে। একেই ভয় পায় সমস্ত যুগের শাসক শ্রেণি। ফলে তারা কখনো আইন দ্বারা বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে কখনো সকল প্রকার সম্ভ্রাসী অপশক্তি দিয়ে কণ্ঠ রোধ করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া শিক্ষার পরিবেশ থাকে না। তাই সম্ভ্রাস-দখলদারিত্বমুক্ত গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস শুধু শিক্ষার জন্য নয় সামাজিক দায়বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য প্রয়োজন। বর্তমান রাজনীতির চিত্র দেখে ভীতসন্ত্রস্ত কিংবা রাজনীতিবিমুখতা নয়, আদর্শভিত্তিক পাল্টা রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণের মধ্য দিয়েই এ থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। ফলে বুয়েটসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন অধিকার নিশ্চিত এবং অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে শুধু ক্যারিয়ার সর্বস্ব, সমাজের প্রতি দায়হীন, দক্ষ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, দেশের মানুষের প্রতি উদাসিন অথবা দুর্বল কোনভাবেই দেখতে চাই না।

যে কোন আন্দোলনের একটা ফলাফল আছে। সেটা সাময়িক বা সুদূরপ্রসারি যাই হোক না কেন। সাময়িক উত্তেজনা মানুষ যা চায় কিংবা চোখের সামনে দৃষ্টান্ত দেখে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে দেখার ইচ্ছা বা সময় থাকে না। বিরক্তি বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটে তখন যাচাই-বাছাই করার মানসিকতা বা ধৈর্য থাকে না। ফলে তার আকৃতি থাকে কিন্তু প্রকাশটা সবসময় যথাযথ হয় না। বুয়েটের ছাত্র আন্দোলনের আকৃতি হলো সম্ভ্রাস থেকে মুক্তি। তাকে রাজনীতি বিযুক্ত ক্যাম্পাসের দাবি মনে করলে তা হবে ভবিষ্যতের জন্য এক অশনি সংকেত।

কমরেড হায়দার আকবর খান রনোর মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১১ মে গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য দেওয়া এক বিবৃতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক, প্রবীন বামপন্থি তান্ত্রিক ও লেখক কমরেড হায়দার আকবর খান রনোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শিক্ষা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনসহ জনজীবনের সমস্ত সংগ্রামে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আমৃত্যু তিনি এ স্বপ্ন লালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বরণ্য দেশপ্রেমিক সাহসী বামপন্থি নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাকে হারালো।

কমরেড ফিরোজ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৩ মে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতনের নেতৃত্বে ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়।



শোষণ-বঞ্চনা ও ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির লড়াই ছিলো মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতার স্বপ্ন

বাসদ : চট্টগ্রাম জেলা শাখা

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে রাত ১০টায় চট্টগ্রামে শুরু হয় যুব বিদ্রোহ। বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। লড়াইয়ের রসদ হিসেবে অস্ত্রসস্ত্র জোগাড় করে, পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাক দখল করে চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নেয়। বিপ্লবীরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মিলিটারি কায়দায় কুচকাওয়াজ করে সূর্য সেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সূর্য সেন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।

‘ভারতে বিপ্লবের মহান দায়িত্ব ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির উপর পড়েছে। আমাদের জাতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নপূরণের জন্য বিপ্লবের এই দেশপ্রেমিক কাজটি করার গৌরব আমাদের চট্টগ্রাম অর্জন করেছে। এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, আজ আমাদের বিপ্লবী বাহিনী চট্টগ্রামে সরকারের শক্ত ঘাঁটি দখল করেছে, ...অত্যাচারী বিদেশি সরকারের কর্তৃত্ব বন্ধ হয়ে গেছে। বিজয়ের জাতীয় পতাকা উড়ছে। জীবন ও রক্ত দিয়ে এর মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য’।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ’২৪ চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দিবসে বিদ্রোহের নেতৃত্বদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নগরীর জেএমসেন হল সংলগ্ন মাস্টারদা সূর্য সেনের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পমাল্য অর্পণকালে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার ইনচার্জ আল কাদেরী জয়, সদস্য আহমদ জসীম, পুলক দাশ, মহিন উদ্দিন, প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্টের সদস্য অ্যাড. মাহমুদুল হাসান, নাজমুল হাসান, শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা নাজিমউদ্দীন বাপ্পি, মোহাম্মদ খোরশেদ, নুরুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি



মিরাজ উদ্দিন, স্কুলবিষয়ক সম্পাদক উম্মে হাবিবা শাবণী, সদস্য অরুণ মহাজনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ থেকে ৯৪ বছর আগে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ। ব্রিটিশ শাসকদের জুলুম-অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার নির্মম কষাঘাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে জীবনপণ বাজি রেখে সেদিন এদেশের তরুণ-যুবকরা এই বিদ্রোহের সূচনা করে।

স্বদেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। একটি স্বাধীন, মানবিক মর্যাদার ও গণতান্ত্রিক সমাজ, প্রতিষ্ঠা ছিলো এই লড়াইয়ের মূলমন্ত্র। সেই স্বপ্ন বুকে ধারণ করে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পর বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আজও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ পাঠ্যপুস্তকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার আহবান জানায়।

৫ মে বীরকন্যা প্রীতিলতার ১১৩তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

প্রীতিলতা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম নেতা। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাবে আক্রমণ করা হয় এবং আহত হয়ে প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্নে আত্মদান আমাদের প্রেরণা।

প্রীতিলতার জীবনপঞ্জি

৫ : মে ১৯১১ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ধলঘাট, গ্রামে জন্ম।

১৯১৮ : ডা. খাস্তগীর ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রাথমিকে ভর্তি।

১৯২৬ : সংস্কৃত অলংকার পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ।

১৯২৮ : এ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ ও ঢাকা ইডেন কলেজে



ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। বিপ্লবী লীলা রায়ের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯৩০ : ইন্টারমিডিয়েটে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সবার মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। কলকাতার বেথুন কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি। গুনু পিসীমার সাথে পরিচয়।

১৯৩১ : বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ। ৪ আগস্ট রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির মধ্যে আত্মোৎসর্গের পর বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ।

১৯৩২ : কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংকসনে বি. এ পাশ। চট্টগ্রামে অপর্ণাচরণ দে হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগদান। বিপ্লবী নির্মল সেনের সাথে সাক্ষাৎ।

মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা। ১৩ জুন ধলঘাটের সংগ্রাম। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের প্রাণদান।

৫ জুলাই গৃহত্যাগ।

২৪ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বদান ও দেশের প্রথম নারী শহিদ হিসাবে গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি।

ময়মনসিংহ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলা শাখার কাউন্সিল ২৩ মার্চ রেলওয়ে মালগুদামাস্থ জেলা কার্যালয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাকীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল উদ্বোধন করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ি। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাসদ ৫ নং জোনের সমন্বয়ক কমরেড ইমাম হোসেন খোকন, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক অনুপম সরকার, সদস্য নজরুল ইসলাম।

কাউন্সিলে আব্দুল্লাহ আল নাকীবকে সভাপতি,

জাসিরুল ইসলাম রিয়াদকে সহসভাপতি, তানজিল হুসাইন মুণিমকে সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ালিউল্লাহ শেখকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়।

কাউন্সিলে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব না নিয়ে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তুলছে। সরকার কোন ধরনের গবেষণা না করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ চালু করছে। এই শিক্ষানীতির পদ্ধতিগত দিক নিয়ে আরও ব্যাপক মতামত নেয়া ও গবেষণার ফলাফল হাতে না আসা পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ২০২১ স্থগিত করার দাবি জানান।



বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন

বাংলাদেশে ৪৮তম ফিলিস্তিন ভূমি দিবস পালিত



৪৮তম ফিলিস্তিনি ভূমি দিবসে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আহ্বানে ঢাক, শাহবাগে ৩০ মার্চ ফিলিস্তিন সংহতি দিবস পালিত হয়।

উফডি জেনারেল কাউন্সিল সদস্য জাহাঙ্গীর আলম নানুর সভাপতিত্বে ও মাহির শাহরিয়ার রেজার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন খ্রিস্ট, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসান তারিক চৌধুরী, উফডির সদস্য হাফিজ আদনান রিয়াদ, বাংলাদেশ যুব মৈত্রীর

সভাপতি তৌহিদুর রহমান, জাতীয় যুবজোটের সভাপতি শরিফুল কবির, জাহিদুল ইসলাম সজীব, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি দীপক শীল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউড়ি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-জাসদের সভাপতি রাশেদুল হক ননী, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি অতুলন দাস আলো এবং বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য লাকী আক্তার।

সমাবেশে উফডি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠ করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীন। সমাবেশে গান পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা।

জাতিসংঘ থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সব প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ইসরায়েলের বিচার করতে হবে। ফিলিস্তিনের মানুষদের ওপর ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী দিনের পর দিন আক্রমণ চালাচ্ছে। অবিশ্বাস্যভাবে নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশ শিশু ও নারী। এটা বর্তমান সময়ে এই ধরনের গণত্যা চিন্তা করাও কঠিন। তারপরও দিনের পর দিন সেটা অব্যাহত আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও ভারত সমর্থন দেওয়ার কারণে ইসরায়েল তা চলতে পারছে।

চিঠিতে বলা হয়, আপনার সদয় অবগতির জন্য আমাদের পরিচয় জানাতে চাই: ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি বাংলাদেশ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ এবং নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পেশাজীবীদের একটি মঞ্চ। আমরা বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল কর্তৃক নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞসহ ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যান্য অপরাধের প্রতিবাদে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পক্ষে সক্রিয় রয়েছি। তারই ধারাবাহিকতায় ইসরায়েলকে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করার সুনির্দিষ্ট দাবি বাস্তবায়নের অনুরোধ করতে আপনাকে এই পত্রটি পাঠাচ্ছি।

বাংলাদেশের জনগণ ৫৩ বছর পূর্বে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা একটি নৃশংস ও ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হয়েছিল। সেই গণহত্যার দুঃখজনক ও নির্মম স্মৃতিকে স্মরণ করার সময়ে আমরা পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও অধিকাংশ দেশের সঙ্গে অত্যন্ত হতাশা ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বিশ্বের সকল স্বীকৃত সভ্য নিয়মকানুন ও রীতিকে পদদলিত করে এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের গাজায় প্রায় ২৫ লাখ নারী-পুরুষ-শিশুর বিরুদ্ধে প্রায় ছয় মাস ধরে বিরামহীনভাবে দানবিক গণহত্যা পরিচালিত করে চলেছে দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল।

গত ৭ অক্টোবর থেকে পরিচালিত ইসরায়েলের সামরিক অভিযানসহ নজিরবিহীন মানবতাবিরোধী, দানবিক ও নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডে আমরা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ :

• ইসরায়েল ছয় মাসের চলমান সামরিক অভিযানে ৩২,১৪২ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি

নারী-পুরুষ, শিশুকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ১৩,০০০ শিশু এবং নিখোঁজ ৭,০০০ মানুষ। আর আহত হয়েছেন ৭৪,৪১২ জন (২৩ মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান)। দৈনিক গড়ে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১,৭০০ জন। এই সময়ে অধিকৃত পশ্চিমতীরে ১১৬ জন শিশুসহ নিহত হয়েছেন আরও ৪৪২ জন এবং আহত হয়েছেন ৪,৬৬৫ জন। এখনও অব্যাহত হত্যায়জ্ঞের হিসাবে প্রতিদিন আরও শত শত মানুষ গণহত্যার শিকার হচ্ছে। (উল্লিখিত সংখ্যাগুলো প্রতিদিন বাড়ছে)।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের দেয়া ভাষ্য অনুযায়ী গাজায় ২৫,০০০ নারী ও শিশু গণহত্যার শিকার হয়েছেন।

• গড়ে প্রতিদিন ৬৩ জন করে মোট ৯,০০০ নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে প্রতিদিন ৩৭ জন করে মাতাকে হত্যা করা হয়েছে।

• গাজায় ১০ লাখ শিশু ট্রমাতে আক্রান্ত; এদের ৭০ শতাংশ ট্রমা-পরবর্তী অসুস্থতায় (পিটিএসডি) ভুগছে। পিতা-মাতা, অভিভাবক হারানো ১৭,০০০ শিশুকে দেখাশোনার মতো পরিবারের কেউ জীবিত নেই।

• নির্বিচার বোমা বর্ষণে গাজার ৬০ শতাংশের বেশি ঘরবাড়ি ও বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে; যা থেকে সৃষ্ট কংক্রিটের আবর্জনার পরিমাণ ২,৩০,০০,০০০ মেট্রিক টন। পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট এই ধ্বংসযজ্ঞ বিপুলসংখ্যক মানুষকে আশ্রয়হীন করেছে।

• পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য আশ্রয়কেন্দ্র, জাতিসংঘের অবকাঠামো, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সিংহভাগ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সরকারি দপ্তর, মসজিদ ও গির্জা; লাইব্রেরি, নাট্যশালা, সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে শুরু করে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ।

• ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞ ও আক্রমণ নানামুখী: তারা নির্বিচারে হত্যা করছে শত শত সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-খেলোয়াড়, শিক্ষক-গবেষক, শিক্ষার্থী-ত্রাণকর্মী; জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মী, জাতিসংঘের উদ্বাস্ত ও ত্রাণ সংস্থার দপ্তর ও ভাণ্ডার এবং একাধিক বিদেশি নাগরিককে। ইসরায়েল ফিলিস্তিনের কমপক্ষে তিনটি প্রজন্যকে পরিকল্পিতভাবে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাদের বঁচে থাকার অধিকার ও সম্ভাবনা, ইতিহাস-সংস্কৃতি, জীবনজীবিকার উপায়, খাদ্য-

পানীয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ ধ্বংস করার মাধ্যমে।

• গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি ইসরায়েলের বহুমুখী আক্রমণ ও প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে বিশেষভাবে জাতিসংঘ; তার বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোতে কর্মরত কর্মচারী ও কর্মকর্তারা। জাতিসংঘ ও তার সহযোগী সংস্থাগুলোকে ফিলিস্তিনে গণহত্যা ও জাতিগত বিনাশ/উচ্ছেদের (এথনিক ক্লিনজিং) পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে ইসরায়েল বিশেষ প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে জাতিসংঘের বিরুদ্ধে। মিথ্যা অভিযোগ ও প্রচারণার ভিত্তিতে ত্রাণ সংস্থার তহবিল বন্ধ করার পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়েছে।

• গণহত্যার প্রতিবাদকারী যেকোনো দেশ, সংস্থা/সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি তারা একই প্রতিহিংসা চরিতার্থ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ব্যক্তিগতভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং জাতিসংঘ তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু; জাতিসংঘকে ঘোষণা করা হচ্ছে—ইহুদি বিদ্বেষী ও সম্ভ্রাসবাদের সহায়তাকারী হিসেবে।

• আমরা গভীর হতাশা ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি ইসরায়েল তার সকল অপরাধগুলো নিরাপদে ও বিনা বাধায় চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপী ইউনিয়নভুক্ত কিছু দেশ, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ নৈতিক, কূটনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক সহায়তার মদতে।

• ইসরায়েলের বহুমুখী যুদ্ধকৌশলের অন্যতম নির্মমতা এখন আমরা তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি গাজায়; বিশেষত রাফাহ শহরে আটকে পড়া ১৫ লাখ বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে। উপায়হীন বিরাটসংখ্যক উদ্বাস্তকে ইসরায়েল তার জাতিগত বিনাশ/উচ্ছেদের (এথ নিক ক্লিনজিং) অংশ হিসেবে বিশ্ব জনমতকে অগ্রাহ্য করে সেখানে বড় আকারে সামরিক হামলা চালাবার ঘোষণা দিচ্ছে। অন্যদিকে ত্রাণ সামগ্রী চুকতে দেয়া ও বিতরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইসরায়েল গাজার ২৫ লাখ মানুষকে অনাহার ও অপুষ্টিতে হত্যা করার জন্য দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে। ত্রাণ সংগ্রহ করতে সমবেত ক্ষুধার্ত মানুষকে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়মিত হত্যা করছে একের পর এক ঘটনায়। জাতিসংঘের ত্রাণ সাহায্য সংস্থার উপর হামলা, তাদের কর্মী হত্যা, ভিসা প্রদান বন্ধসহ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে অব্যাহতভাবে।

• সারা বিশ্ব সুস্পষ্টভাবে জানে ইসরায়েল ১৯৪৮ সালে তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘ গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলিকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে এসেছে। আমরা এটাও জানি ২০১৫ থেকে ২০২২ সালে গৃহীত ১৪০টি প্রস্তাবের একটিও ইসরায়েল মেনে চলেনি। জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করার পাশাপাশি ইসরায়েল জেনেভা কনভেনশন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল মৌলিক নীতিকে অমান্য করে এসেছে ৭৫ বছর ধরে।

• অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আদালত প্রদত্ত নির্দেশনাগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

• আমরা তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলতে চাই, বৈশ্বিক সকল আইন ও নীতিকে অগ্রাহ্য করে দখলদার ও বর্ণ-বৈষম্যবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রমাণ করেছে সে সভ্য দুনিয়ার সদস্য নয়।

এমতাবস্থায়, আমরা মনে করি ক্রমাগতভাবে জাতিসংঘের সনদ এবং সিদ্ধান্তসমূহ অমান্যকারী দেশ হিসেবে ইসরায়েলের জাতিসংঘসহ এর সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার ও সুযোগ নেই। তাই অনতিবিলম্বে ইসরায়েলকে জাতিসংঘ চার্টারের সদস্যপদ সংক্রান্ত ধারা-৬ অনুসারে জাতিসংঘ ও তার সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা নেবার জন্য আমরা আপনার মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি আপনি এ বিষয়ে আমাদের আহ্বান ও দাবিটি সকল সদস্য-রাষ্ট্রের নজরে আনার ব্যবস্থা নেয়াসহ অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

এ বিষয়ে আপনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকে আমরা অগ্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্বায়ক ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ অনুলিপি:

১. UN Resident Coordinator, & UNDP Resident Representative

২. মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩. বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের অন্যান্য দপ্তরের প্রধানগণ।

বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দ দাও, কৃষক-খেতমজুরদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

নবম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আগামী জুন মাসে সংসদের জাতীয় বাজেট অধিবেশন বসবে। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দ করার দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু স্বাধীনতাগের গত ৫৩ বছর কোন সরকার এতে কর্ণপাত করেনি। এবারের জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দ, প্রত্যেক ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র খুলে খোদ কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদন খরচের সাথে ৪০ শতাংশ মুনাফা দিয়ে কমপক্ষে ৫০

লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা, গ্রাম-শহরে শ্রমজীবীদের জন্য আর্মি রেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালুসহ ৮ দফা দাবিতে আগামী ১০ মে থেকে ২৫ মে ২০২৪ দেশব্যাপী দাবিপক্ষ পালন ও আগামী ২৬ মে উক্ত দাবিতে ডিসি, ইউএনও-র মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি সফল করার জন্য সারাদেশের কৃষক খেতমজুরদের প্রতি নেতৃবৃন্দ উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ কৃষক-ক্ষেতমজুরদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সদস্য হয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সারাদেশের কৃষক ক্ষেতমজুরদের প্রতি আহ্বান জানান।

যশোরে সমাজতান্ত্রিক কৃষক ফ্রন্টের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার কর্মীসভা ১৭ মার্চ আব্দুল বাকের টুটুলে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত। সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড বজলুর

রশীদ ফিরোজ, অর্থ সম্পাদক কমরেড শফিউর রহমান শফি, সদস্য অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু, বাসদ যশোর জেলা শাখার আহ্বায়ক শাজাহান আলী প্রমুখ।



সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের কৃষক-খেতমজুর কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সব ধরনের প্রতিকূলতা মোকবিলা করে তারা উৎপাদনের চাকাকে সচল রেখে নিজের জীবনকে নিঃশ্ব করছে। সরকার এদের প্রতি উদাসীন, যে কারণে বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ নামমাত্র। শুধু তাই নয় দিনে দিনে তা কমছে। তারা কৃষি ফসলের লাভজনক দাম পায় না। তাদের উৎপন্ন নিয়ন্ত্রণ করে সিভিকেট

ব্যবসায়ী। নেতৃবৃন্দ বলেন, কৃষকরা সংখ্যায় অধিক কিন্তু অংসগঠিত, তাই অসহায়। এই অসহায় দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তির জন্য সংগঠিত হতে হবে, অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন হতে হবে। শোষণ-নিপীড়নের কারণ বুঝতে হবে। দুর্বৃত্তায়িত, লুটেরা রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে, সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে মুক্তি অর্জন করতে হবে।

শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে মে দিবস পালিত

৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, ন্যায্য মজুরির লড়াইকে সমাজবদলের লড়াইয়ে পরিণত করুন



গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আদায়ের লড়াই জোরদার করুন

১৩৮তম মহান মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত

হয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদস্য আফজাল হোসেন ও রতন মিয়া। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্ট এর সদস্যসচিব অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

প্রসঙ্গ বুয়েট : ছাত্র রাজনীতিই কি বলির পাঠা?

শিক্ষা মানুষকে চেতনা দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে শুধু এক দল দক্ষ মানুষ তৈরি হবে তাই নয়, এমন এক প্রজন্ম তৈরি হবে যারা চিন্তা করবে জীবন ও জগত নিয়ে। যারা চিন্তা করবে দেশ ও জনগণ নিয়ে, দায় অনুভব করবে মানুষের প্রতি। যে কারণেই বলা হয় উচ্চতর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চতর নৈতিক বোধ গড়ে তোলে। তা না হলে আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, সুসমন্বিত মানুষ গড়ে উঠা সম্ভব হয় না।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন কারণে সারা বছরই উত্তাল থাকে। যেখানে তারুণ্য সেখানে উদ্দীপনা, উত্তেজনা থাকবেই। কিন্তু যেসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তাল হয়ে উঠে তা কোন দেশের জন্য সুখকর নয় বরং সমাজে আতঙ্ক ছড়ায়। কখনো র্যাগিং, নিপীড়ন বিরোধী কখনো ধর্ষণ বিরোধী, কখনো হল দখল, কখনো চাঁদার ভাগ, কখনো নিয়োগ বাণিজ্য বিরোধী আর কখনো প্রতিপক্ষকে হামলা করে তাড়িয়ে দেয়া, এসবই হলো উত্তেজনার কারণ। শিক্ষার নীতি, শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন হয় কিন্তু সেগুলো তেমন গুরুত্ব পায় না প্রচারমাধ্যমে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় মানে ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। অনুগত ডিসি, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন আর দুর্বিনীত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এই ত্র্যহস্পর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্রমাগত নিম্নমুখী। অথচ একটা দেশের ভবিষ্যৎ বলতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৃষ্ট জ্ঞান আর পাশ করে বেরিয়ে আসা দক্ষ যুব শক্তি ছাড়া অন্য কিছু কি আছে? সে কারণেই দেখা যায় যে, দেশ বা সভ্যতা যত উন্নত তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

তত উন্নত। এই উন্নতি শুধুমাত্র দালান কোঠার নয়, শিক্ষার মান এবং পরিবেশের। দেশের জনগণ তাদের ট্যাক্সের টাকা বিনিয়োগ করে পরবর্তী প্রজন্মকে জ্ঞান, মেধা, দক্ষতায় বিকশিত করবার জন্য। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় হলো সামাজিক বিনিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভ এবং ছাত্র রাজনীতি এখন ব্যাপক আলোচনার বিষয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ফেনী নদীর পানি ভারতকে দেয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্ররা হত্যাকারীদের এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ছাত্ররা দাবি জানায় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আপাতত প্রশমিত হয় আর ছাত্রলীগ এই ঘটনার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায় থেকে সাময়িক রেহাই পায়। একটা বিষয় ভুলে গেলে চলবে না, এই বুয়েটেই ছাত্র দলের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে নিহত হয়েছিল সনি। তখনও প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে বন্ধ হয়েছিল ছাত্রদলের কার্যক্রম। আর আবরার হত্যাকাণ্ডের বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই বাম প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের ওপর হামলা-নির্যাতন চালিয়ে ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলো এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

আমেরিকায় উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয়

গণহত্যা ও জায়নবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত

ইসরায়েলিরা নরক বানিয়ে ফেলেছে গাজাকে। এত নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছে যার বর্ণনা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যতটুকু প্রকাশিত হয় তা পড়তে গিয়ে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছেন এমন কেউ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাড়িয়েছে ইসরায়েলের পক্ষে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যারা মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত সে সব দেশের অতীত নীরবতা, এমনকি মার্কিনীদের সাথে থেকে গাজায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ না করা দেখে যখন গণমানুষ বিক্ষুব্ধ তখন অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকের মতো আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রদের প্রতিবাদ গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছে। দেড় শতাব্দিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের নির্যাতন মোকাবিলা করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিক্ষোভ চলছে। ছাত্রদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শিক্ষকরাও। ইতিমধ্যে ৫০ জন অধ্যাপকসহ আড়াই হাজার প্রতিবাদকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। গাজায় বিপন্ন মানুষের পাশে এখন প্রতিবাদী তারুণ্য। ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলের রাফায়া উদ্বাস্তুদের তাঁবুর সামনে টানানো একটি ব্যানার সকলের মনোযোগ কেড়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, ‘কলাম্বিয়ার শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ’। উদ্বাস্তুদের তাঁবুর সামনে বিক্ষোভরত মার্কিন শিক্ষার্থীদের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এমন অনেক ব্যানার ঝুলছে। এক অন্য আমেরিকাকে দেখছে গোটা দুনিয়া। ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ এবং ইসরায়েল ও তার সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে এক অভূতপূর্ব ছাত্র বিক্ষোভের সাক্ষী হলো আমেরিকা। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে টেক্সাস পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাব্দিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নানা অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের মুখোমুখি হয়ে স্লোগানে প্রকম্পিত করে যাচ্ছে তাদের ক্যাম্পাস। সেখান থেকে স্লোগান উঠছে, স্বাধীন ফিলিস্তিন চাই, গণহত্যা বন্ধ কর, ফিলিস্তিন শিশুদের রক্তে আমরা আমাদের হাত রাঙাতে চাই না, ইসরায়েল ও ইসরায়েলি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর, যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাইডেন প্রশাসন কার্যকর উদ্যোগ নাও।

ফিলিস্তিনে ইতিহাসের যে ভয়াবহতম গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল তার অন্যতম সহযোগী ও মদদদাতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে নানাভাবে ফিলিস্তিন জনগণের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে মার্কিন শাসকেরা। এ হামলা আত্মসন নতুন নয়। গত প্রায় ৭৫ বছর ধরে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

গাজায় গণহত্যা বন্ধ কর

জাতিসংঘ থেকে ইসরায়েলকে বহিস্কার দাবি



ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি

ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কারের দাবিতে ২৫ মার্চ ‘ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি’র উদ্যোগে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর ঢাকার আগারগাঁওয়ের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ও তার মাধ্যমে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কমিটির আহ্বায়ক ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল কুফী রতন, সমাবেশে চিঠির একটি বাংলা অনুলিপি পাঠ করেন কমিটির সদস্য ওমর তারেক চৌধুরী। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক হারুন-অর রশীদ। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, কবি হাসান ফখরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আজ সারা পৃথিবীর মানুষ বিক্ষুব্ধ। ইসরায়েলের কোনো অধিকার নেই জাতিসংঘে থাকার। জাতিসংঘের সব সংস্থা থেকে ইসরায়েলকে বহিস্কার করে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার যে, বিশ্বে এখনো মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব আছে। ফিলিস্তিন এখন অবরুদ্ধ কারাগার। সেই কারাগারে ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। হিটলার যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল, ইহুদিদের বিরুদ্ধে এখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ একই কাজ করছেন।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ‘জাতিসংঘের এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১